173

আটাকাটি।

সমাজ-সংস্কারক সন্দর্ভ।

শ্রীযুক্ত টেকচাঁদ ঠাকুরের প্রিয়বন্ধু

শ্রীযুক্ত কাটিরাম ঠাকুর প্রণীত।

"আত্মনঃ প্রিয়তয়া তনুভাজাম্
নাত্মনঃ কৃতিষু দূষণদৃষ্টিঃ।
সর্ব্বতস্তিমিরমস্যতি দীপো-
নাত্মমূলতিমিরং বিনিহন্তি ॥"
কবিকর্ণপূরঃ।

কলিকাতা;

গোরাবাগান ষ্ট্রীট, ২সংখ্যক ভবনস্থ নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে
শ্রীযুক্ত এইচ্, এম্, মুখোপাধ্যায় এবং কোম্পানি
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন ১২৯১ সাল।

বিজ্ঞাপন।

আটাকাটির সম্বন্ধে কোনরূপ বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রয়োজন দেখি না। তবে এখনকার সময়ের একজন খুব উচ্চদরের লোক এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া যেরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন সেইটীই কেবল এইখানে লিখিত হইল।

গ্রন্থকার।

অভিমত যথা ;—

প্রিয় মহাশয়! আপনার আটাকাটি পড়িয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। এরূপ সমাজ-সংস্কার পুস্তক যে বঙ্গভাষায় অদ্যাপি প্রচার হয় নাই ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি। ইহা যেরূপ ব্যঙ্গোক্তিতে লেখা হইয়াছে তাহা সভ্যসমাজের অত্যন্ত আদরণীয় সন্দেহ নাই। অধিক আর কি বলিব এই পুস্তক আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের কাছেই আদরণীয় হইবে।

কশ্চিৎ দর্শক।

আটাকাটি।

প্রথম কাটি।

ঊনবিংশ শতাব্দী।

ইহা অন্য সময় নহে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ; বড় ভয়ানক সময়। এখন ফাকি ফুকি দিয়া কেহ যে এড়াবেন, তাহার আর যো নাই। একালে আগেকার ন্যায় বুজরুকি মুজরুকি আর খাটে না; গুরুর শাপ মন্যু, পুরুতের ভুরুৎগিরি ও ভূতুড়ে ওজার ভূত প্রেত নামান প্রভৃতি ভয়ানকতর কাণ্ড কারখানা এখন আর খাটে না; এখন যিনি যত চালাকি খেলিতে যাবেন তিনি তত ধরা পড়িবেন। এখনকার সমাজ ও সভ্য সামাজিকগণ আগেকার ন্যায় বোকা নহে, ইহারা আলাদা রকমে গঠিত; এদের কাছে যিনি যত জারি জুরি করিবেন যত চালাকি খেলিবেন, তিনি তত আটাকাটিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িবেন।

তাই বলে এইকালে বঙ্গদেশ যে একেবারে বোকাশূন্য হইয়াছে তাহাও নহে; যদি তাহা হইত, তাহা হইলে প্লেন্‌চিট্

এক টুকরা কাষ্ঠ বেচে আর এ দেশ থেকে তিন লক্ষ টাকা হাত করিয়া বিলাতে পলায়ন করিতে পারিত না এবং হৃদয়ের হৃদয় অক্ষয়কবচও লোকে তত হাঁকু পাঁকু করে ক্রয় করিত না।

এই উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের খুব চর্চ্চা হইতেছে; খেতে বিজ্ঞান, শুতে বিজ্ঞান, হিন্দু শাস্ত্রের প্রত্যেক বচনে বিজ্ঞান, ঋক্ সাম প্রভৃতি বেদেও বিজ্ঞান সুতরাং হৃদয়ের হৃদয় অক্ষয় কবচেও বিজ্ঞান বিরাজ করিতেছে; কাজেই ব্যাসদেব-প্রণীত অক্ষয় কবচ আর কেহই মানে না; কারণ, তাহাতে বিজ্ঞান নাই। যদি তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি কোন বিজ্ঞান বিৎ মহাত্মা এ সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত অক্ষয় কবচে কিছু বিজ্ঞান দেখাইয়া দিতে পারেন তাহা হইলেও বা এ সময়ে বুড়ো ঋষিটার কোন রূপে মানটা রক্ষা হইত।

এখন ডাইনের রোজা, ভূতের রোজা, প্রভৃতি গুণিলোক সব অস্তে যাইতে উদ্যত হইয়াছে, ইংরাজী বিদ্যার বলে সব ছেলে গুলা চতুর চূড়ামণি হয়ে দাঁড়িয়েছে; এখন আর ফাকি দিয়া চলিবার যোটি নাই।

পুরুত ঠাকুরেরা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহা অনেক দিন ফুরিয়ে গিয়াছে। এখন বিজ্ঞান বলে আর কেহ ঐ সকল ভণ্ডামির দিকে বড় ঘ্যাঁসে না। এখনকার দাড়িয়াওলা যুবকদিগের কাছে ভণ্ডামি করিয়া কেহ যে পার পাইয়া যাইবেন তাহার যো কি? বর্ত্তমান কালের যুবক দল অত্যন্ত হুনিয়ার, কোনরূপ ভেলকি মেলকি দেখে ইহারা কোনরূপেই ভুলিবার ছেলে নহে।

সে কালে প্রায় সকল পাড়াতেই একজন করিয়া পাকা চুলো বিধবা ঠাকরুণদিদি থাকিতেন, যদি কখন কাহারো ছেলেকে ডাইনে দেখিত, তাহা হইলে ছেলের মা তাড়াতাড়ি এই ঠাকরুণদিদির কাছে থেকে জল পড়ে নিয়ে যেতেন; ঠাকরুণ দিদিও মন্ত্রবলে আট্ আঙুল কাটিকে দশ আঙুল করিয়া স্ত্রীলোকদিগের কাছে আপনার খুব বুজরুকি দেখাইতেন।

এই ঠাকরুণদিদি অনেক ছিটে ফোটা মন্ত্র তন্ত্র দ্বারা লোকের চিত্তকে বিমোহিত করিয়া, কলাটা মূলাটা পাড়া হতে আদায় করিতেন, তাহাতেই তাঁহার এক প্রকার চলিয়া যাইত। প্রত্যেক পাড়ার অধিত্রষ্ঠাত্রী দেবতা স্বরূপ এই ঠাকরুণদিদি সকল ঘটেই থাকিতেন। বৌতে বৌতে ঘরাও ঝগড়া হইলে সেখানে আগে গিয়া উপস্থিত হইতেন এবং যাহাতে ঝকড়াটা বেশ পাকিয়ে উঠে তাহারই চেষ্টায় ফিরিতেন। ইহাঁরা লোকের ঘর ভাঙ্গিতে ও কাণ ভাঙ্গিতে বড় পটু ছিলেন।

ইহা ত গেল বিধবা পাকা চুলো ঠাকরুণদিদির কথা; ইহা ছাড়া মধ্যে আর একরূপ গ্রাম্য দেবতার আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহারা উনবিংশ শতাব্দীর সধবা গ্রাম্যদেবতা। এই সধবা দেবতার মধ্যে সকলেই প্রায় কুৎসিত ও আমচুরের ন্যায় সুঁটকি। কুৎসিত বলিয়াই ইহাঁরা মন্ত্র তন্ত্র জানি বলিয়া, পাড়া প্রতিবাসীদের কাছে ভাণ করিয়া আত্মগৌরব রক্ষা করিতেন; নতুবা ইঁহাদিগকে কেহই মানিত না।

এই সুন্দরীদের মধ্যে কাহারো পার আঙ্গুল গুলা বাঁকা, কাহারো বা মাথার চুল নাই, তবুও পরচুলা দিয়া, খুব বড় করে কবরী বন্ধন করিতেন; কেহ কেহ বা বোঁচা ও শ্যামা ঠাকুরাণীর ন্যায় কোল কুঁজো সুতরাং ইহাঁরা ছিটাফোটা মন্ত্র তন্ত্র জানি বলিয়া ভাণ না করিলে, পড়ায় তিষ্ঠিতে পারিতেন না; এই জন্য ইহারাও সময়ে সময়ে জল পড়িয়া দিতেন, কখন বা পাড়ার বৌ ঝিদিগের কিক বেদনা ঝাড়াইতেন ও কোন কোন সময়ে কাহারও ছেলে পিলের জ্বর জাড়ী হইলে নাড়ী টিপে বলিতেন, "বড় রসস্থ করে জ্বর হয়েছে আজ দুটা হরিতকীর কাওয়া করে খাইয়ে দাও।" ইহাদিগের মধ্যে যিনি যত কুৎসিত মন্ত্র তন্ত্র বিষয়ে তিনি তত ওস্তাদ। যাহাই হউক নানা ফিকিরে ফাকারে ইহারা পাড়ার মধ্যে স্ত্রীলোকের চাঁই হয়ে থাকিবার চেষ্টায় সর্ব্বদা ফিরিতেন।

ইহাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যস্থলের লোক; সংপ্রতি ইহাদের ইজ্জত নষ্ট করিবার যো হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ঐ সকল ভারি ভুরি আর বড় একটা খাটে না। ইংরাজী বিদ্যাবলে ও বিজ্ঞানের শক্তিতে এখনকার চাঁই রমণীদিগের মন্ত্র তন্ত্র আর বড় আদর পায় না। এখন যদি কখন কোন নতুন ঠাকরুণদিদি, কি কোন সধবা স্মুর্টাক প্রৌঢ়া চাঁইগিরি করিতে যান তা হলে নব্যদলের ছেলেদের কাছে হয় ত দুই চারিটা ধমক খাইয়া ঠোঁট মুখ চাটা হয়ে পলায়ন করেন।

বর্ত্তমান কালের নব্যসম্প্রদায় বিশেষতঃ বঙ্গবাসী যুবকগণ বিজ্ঞান বলে ও পাশ্চাত্য বিদ্যার শক্তিতে সমস্ত তামাসা ও ভেলকির মর্ম্মোদ্‌ভেদ করিয়া, বিলক্ষণরূপে

লোকের চক্ষুদান দিতেছেন। ইঁহাদের বুদ্ধির কাছে কোন-রূপ জারিজুরি খাটাতে গেলেই সর্ব্বনাশ। ইঁহারা বিজ্ঞান-বলে বলিয়া থাকেন যে, মরা গোরুর ঘাস কাটা আর বাপ মার শ্রাদ্ধ করা সমান কথা। তবে শ্রদ্ধা করিয়া পিতা মাতার উদ্দেশে কিছু খরচ করা মন্দ নহে।

এই নব্য পণ্ডিতেরা আজি কালি নারায়ণের নারায়ণত্ব ও শিবের শিবত্ব প্রায় কাড়িয়া লইয়াছেন; আর দুই এক হ্যাঁচ্‌কান মারিতে পারিলেই শিব ও নারায়ণ ছোলা কলার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া একজন কৈলাসে ও আর এক একজন বৈকুণ্ঠে গিয়া হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

দ্বিতীয় কাটি।

টাকায় শনি লেগেছে।

"Money is money now a days."

অতি প্রাচীন কালে, এমন কি এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাবস্থায়, এদেশের ছেলেগুলা বর্ত্তমান কালের ছেলেদের স্থায়, এত লেখা পড়া শিখিতে পারিত না। তখন বর্দ্ধমান প্রভৃতি রাঢ় প্রদেশ হইতে গোবিন্দ সামন্ত, ঠাকুর দাস্ তা, গণেশ যশ প্রভৃতি আগুরি গুরুমহাশয়েরা এদেশ ওদেশ করিয়া বেড়াইত, যখন যেখানে স্থযোগ পাইত অমনি পাঠশালা খুলিয়া সেইখানে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া যাইত।

কোন খানে ৩০, কোন খানে ৪০ এবং কোন স্থানে বা শতাধিক ছেলে জমিয়া, "ক নিক" "খ নিক" বলে উচ্চরবে স্বর করিয়া পড়ে পড়ে লিখিত; আর শুভঙ্করের আর্য্যা মুখস্থ করিয়া কড়ীকসা, মণকসা প্রভৃতি অঙ্ক কসিতে আরম্ভ করিত। এই সকল লেখা পড়াতেই তখনকার লোকেরা নবাব সরকারে ও জমীদারের জমীদারীতে প্রবেশ করিয়া কর্ম্মকাজ শিক্ষা করিত এবং তাহাতেই তাহারা একরূপ করিয়া চালাইত।

এই সকল লোক স্থশিক্ষিত হইলে, কেহ পাটয়ারিগিরি, কেহ মুহুরিগিরি, কেহ দাওয়ানী ও কেহ কেহ বা নায়েব

দাওয়ানী করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; তখন এখনকার মত খোলা ভাটি ছিল না এবং বিলাতি মদেরও এত আমদানি ছিল না সুতরাং যে ব্যক্তি মাসে ১৫ টাকা বেতন পাইত তাহারও বার মাসে তের পর্ব্ব ফাক যাইত না। আজি কালি পূর্ব্বাপেক্ষা লোকে অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতেছে কিন্তু মদ ও বারাঙ্গণারূপ শনির দৃষ্টিতে কেহ যে দশ টাকা হাতে করে কোন ক্রিয়াকলাপ করিবেন তাহার যো নাই।

এখন যিনি যত টাকা উপার্জ্জন করুন না কেন শনি বেটা পেছনে লাগিয়াই আছে, সে কাহারও হাতে টাকা টেঁকিতে দেয় না। এখনকার একশত টাকা বেতন ফুঁক্‌, নিতে যায়; যিনি মাসে এক শত টাকা বেতন পান তিনি ভাল করিয়া খেতে পান কি না সন্দেহ। কারণ মাসে চারি বার বাড়ী আসিতে হইলে রেল ভাড়া ও গাড়ী-ভাড়ায় প্রায় কুড়ি টাকা নিকাশ; তার পর সেরি, শ্যাম্পি-য়ান ও খোলাভাটি হা করিয়া টাকা গিলিতে আরম্ভ করে, অতএব একশত টাকায় কেমন করিয়া সংকুলান হয়? এর উপর আবার গৃহলক্ষ্মীর গহনা আছে; এক-বার একজোড়া হোগ্‌লা প্যাঁচের বালা দিতে হইলেই বাবুর দফা রফা হইয়া পড়ে।

গৃহিণী যদি অসময়েও একখানা গহনা চাহিয়া বসেন তাহা হইলে পারিব না বলিবার যো নাই, কারণ পারিব না বলিলেই ঘরের লক্ষ্মী অমনি মুখ খানা বিষ পানা করিয়া কথা কবেন, তাহাও আবার ভাল করে নহে; আর

হয়ত এক একবার কথার উত্তরই দেবেন না, ইহাতে বাবু বাঁচেন কিরূপে?

গিন্নী গহনার জন্য মুখ বিষ পানা করেচেন ভাবিয়া প্রথমে তাঁর মাথা ঘুরিতে আরম্ভ করে, তার পর গায়ে একেবারে কুকুরে মাচী লাগে, এক স্থানে স্থির হয়ে বসিতে পারেন না, যেখানে যান সেই খানেই অসুখ, কেহ দুটা ভাল কথা কহিলেও গায় যেন ছুঁচ বিঁধিতে থাকে।

তার পর গিন্নী তাকে তাকে থাকিয়া যখন দেখেন যে ইঁদুর কলে পড়িয়াছে তখন আরও অভিমান, মুখ খান ভালই হউক আর মন্দই হউক একেবারে তোলো হাঁড়ীর মত করিয়া, হল্ হল্ করে রান্নাঘর পানে চলিয়ান।

রবিবারটা এইরূপেই গত হয়। সোমবার দিন আপিসের ভাত রাঁধিতে দেরি করিয়া, গিন্নী ঠাকুরুণ ঝির সঙ্গে ছল করে বকাবকি আরম্ভ করেন; তখন বাবু "এখনো ভাত হলো না" বলে একবার বকিয়া উঠেন, তার পর উপায়ান্তর না দেখে হয় বেয়ারাম হয়েচে বলে আফিসে চিটী লেখেন, আর না হয় ত, ভাত না খাইয়াই অত্যন্ত মরা মনে বাহির হইয়া পড়েন, কিন্তু মনটা প্রায় বাড়ীতেই টাঙ্গান থাকে; তথাপি যাবার সময়ে বলে যান, "রোজ রোজ কি গহনা গহনা করে অত রাগ করিলে চলে, টাকা হাতে হলেই তোমার গহনা গড়িয়ে দেব, এই মাস কাবরায় নিশ্চয়ই তোমার বালা হবে।"

ইহাত গেল একশ টাকা বেতনের কথা, এখনকার ইংলিস গবর্ণমেন্ট খুব মোটা মোটা বেতনও দিয়া থাকেন।

যাঁহারা মাসিক দুশ টাকা বেতন পান তাঁহাদেরও কিছু করিবার যো নাই, কারণ তাঁহাদের মনপাখীও গৃহলক্ষ্মীর আটাকাটিতে সর্ব্বদা আবদ্ধ; বেশির ভাগ বিলাস, বাবুগিরি, উইলসন্ শনি ও ডাক্তার শনিতে ইহাদের বেতনের প্রায় বার আনা রকম প্রত্যেক মাসেই গ্রাস করিয়া ফেলে, সুতরাং দোল দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়া কলাপ করিয়া কিরূপে দশজন কুটুম্ব স্বজনকে আহ্বান করিবেন এবং কিরূপেই বা পৈতৃক ঠাকুর সেবা চালাইয়া দশজন অতিথি অভ্যাগতকে খেতে দিতে সমর্থ হইবেন? কিছুই করিতে পারেন না, কাজেই লোকে বলে, "ওহে প্রাতঃকালে ঐ বড় চাকুরে বেটার নাম করো না, তস্‌লাফেটে যাবে।"

যাঁহাদের ঘাড়ে সবডিবিজানের ভার এবং মাসে চারি পাঁচ শ টাকা বেতন ভোগ করেন তাঁহাদের আরো বিপদ্। পাঁচ সাতটা শনি ইহাদের পেছনে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছে, ইহা এক বারও দেখিতে পান না। এই মহাত্মারা সর্ব্বাপেক্ষা গরীব, কেবল ধোপ কাপড় ও ইজার পেন্‌টুলেন্ ইহাদের মান রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে। মাস কাবরার পরদিন ইহাঁদের হাতে একটী পয়সাও থাকে না, পাঁচ সাতটা শনিতে ইহাঁদের বেতনের টাকা গুলি অতি শীঘ্রই উদরসাৎ করিয়া ফেলে সুতরাং মুদী প্রভৃতি খুজরা পাওনাদারদিগকে আর এক মাস কাব্‌রা দেখাইয়া স্থির রাখেন।

পাঠক যে সকল শনির দৌরাত্ম্যে এই মহাত্মারা একেবারে

ফকির ঐ সকল শনির নাম শুনিবার জন্য বোধ হয় আপনার কৌতূহল জন্মিতেছে; অতএব বলি শ্রবণ করুন। বিলাস, বিলাতি মধু, খোলাভাটি, উইলসনের বিল, ডাক্তার বাবু; বাবুর্চ্চি এই ছয়, আর ঘরের শনি; এই সাত শনি একত্র হয়ে এই বাবুদের অস্থি পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করিতেছে সুতরাং পাঁচ সাত শ টাকা বেতনের বাবুও আটাকাটিতে সর্ব্বদা আবদ্ধ।

শনির দৌরাত্ম্যে ইহাঁদের হাতে টাকা দাঁড়ায় না, কাজেই ইহাঁরা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া করিয়া মনের খেদ মিটাইতে পারেন না; ইহার উপর যদি একটা কন্যাদায় আসিয়া জুটিল তা হলেই একেবারে বাবুর চক্ষুস্থির। তখন বাজার দেনা পোদ্দারের দেনা, কলুর দেনা, ঢুলি বাদ্যকরের দেনা এই পাঁচরকম দেনার জ্বালায় বাবুজী একেবারে অস্থির হইয়া পড়েন, এমন কি শেষে বদলি হইবার চেষ্টা দেখিতে থাকেন।

খোলা ভাটি রূপ শনি ত নিত্যই টাকা গ্রাস করিতেছে, ইহার উপর আবার জজ্ সাহেবের সেসন্ বসার ন্যায় প্রত্যেক মাসে চারিবার করিয়া মদের পার্টি বসিবে, তাহাতেও মাসে প্রায় একশ কি দুইশ টাকা শনিবেটা উড়িয়ে নিয়ে যায়, সেদিকে কাহারো লক্ষ্য নাই, কাজেই বাবুদের হাতে টাকা দাঁড়াইতে পায় না।

ভাই বঙ্গবাসিগণ! এই শনিগুলা যাহাতে দেশ থেকে ছাড়িয়া যায় সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা কর, গ্রহাচার্য্যকে ডাকাইয়া শনির শান্তি কর, তা না হইলে কখনই তোমাদের মঙ্গল হইবে না।

ঐ সকল শনি যে কেবল তোমাদের টাকা নষ্ট করিয়া

নিশ্চিন্ত থাকিবে তাহা মনে করিও না, উহারা পাঁচজনে তোমাদের পরমায়ু পর্য্যন্ত হ্রাস করিয়া দিবে; অতএব তোমরা ভাই এই সময় হইতে খুব সতর্ক হও, ভবিষ্যতে প্রচুর মঙ্গল ভোগ করিতে পারিবে; নতুবা এই পর্য্যন্ত তোমাদের লীলা খেলার শেষ হইল।

তৃতীয় কাটি।

Dam the custom.

সভ্যতা রূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণী যেরূপ সতী ও ধীর প্রকৃতি ইহার আচার ব্যবহারও সেইরূপ চমৎকার, কিন্তু ইহার কতক গুলি বদমাইস্ সহচর ও সহচরী আছে তাহারা কোনরূপেই ইহার সঙ্গ ছাড়িতে চায় না। পাঠক! আপনি তাহাদের নাম শুনিবেন শুনুন—স্বার্থপরতা, প্রবঞ্চনা, আত্ম-স্তরিতা, পরনারী-লালসা, বেশ্যাসক্তি, পশ্বাচার, কাম, ক্রোধ ও লোভ ইত্যাদি। যেখানে সভ্যতা জুটিয়াছে সেই খানেই এই সকল মহাত্মা ক্রমে ক্রমে গিয়া আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়া বসেন।

বর্ত্তমান কালে তেড়িকাটা, তের গিরে ঝুলের পিরাণধারী, পমেটম মাথা ও এষ্টাকিন পায় বি. এ. ক্লাসের কোন যুবার সঙ্গে গিয়া কথা কহ, সে প্রথমে এমনি করিয়া তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবে যে, তাহার কথার প্রত্যেক বর্ণকে যেন অমৃতাভিষিক্ত বলিয়া তোমার প্রতীতি হইবে; তার পর ক্রমে ক্রমে তুমি আলাপ করিতে যত অগ্রসর হইবে, ততই ভুঁভুড়ী বেরিয়ে পড়িবে, তখন পরিষ্কার রূপ সব দেখিতে পাইবে এবং ঐ সভ্যকে একটী আস্ত ভূত বলিয়া তোমার প্রতীতি হইবে। এখনকার নব্য সম্প্রদায় দেশীয় প্রাচীন রীতি নীতির মধ্যে যে গুলি আদরণীয় ও গ্রাহ্য সে গুলি

পরিত্যাগ করিয়া, অন্যদেশীয় নিন্দনীয় রীতিগুলি গ্রহণ করিলে লোকে কিরূপে সন্তুষ্ট থাকিবে? যাঁহারা এখনকার সভ্য এবং সভ্য বলিয়া যথেষ্ট দাবি রাখেন তাঁহারা পেটে না খাইয়াও কোনরূপে একটা তেরগিরে পিরান ও এক জোড়া মোজা কিনিয়া চৈত্র মাসে বেলা দুই প্রহরের সময়ে ঐ মোজা পায় দিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবেন, বৃদ্ধ পিতা মাতা অন্নাভাবে বাড়ীতে হাহাকার করিতেছেন সে দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না; এ অবস্থা দেখিয়া লোকে কিরূপে সন্তুষ্ট থাকিবে?

এইসকল পাশ্চাত্য রীতির অনুসারী যুবকের মধ্যে জন পাঁচ ছয় একত্র হইলেই এইরূপ গল্প চলিতে থাকে—দেখ সুরেন্দ্র! ঐ চাশাধোবা পাড়ার রামযাদু শান্ন্যালকে তুমি কি চেন?

হাঁ বিলক্ষণ চিনি। কেন কি হয়েচে?

তার একটা বার তের বচ্ছরের ভগিনী আছে দেখেচ কি?

হাঁ বিলক্ষণ দেখেচি।

আচ্ছা ভাই বল দেখি তার রূপ লাবণ্য কেমন?

উঃ—ভয়ানক সুন্দরী, যেন আগুণের ফুলকি যেন স্থির বিজরী।

তার সঙ্গে আমার বে হবার কথা হচ্চে।

সুরেন্দ্র শুনিবামাত্র হাহা করে হেঁসে বন্ধুর বাহুমূলে একটা ধাক্কা দিয়ে বলিল "সত্য না কি?"

হাঁ সত্য বই কি মিছে? ঘটক বেটা যাতায়াত কচ্চে এখন বাবার মত হলেই হয়।

সুরেন্দ্র। বটে? ঘটক যাতায়াত কচ্চে? আচ্ছা ভাই সুরেশ! বিয়ে যদি হয় তবে তুমি ওয়াইফের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবে?

সুরেশ। আমি ভাই যা করিব তা মনেই আছে, আগেত বিয়ে হয়ে যাক তার পর দেখো বাবা।

তবু শুনি বলই না কেন।

বে করিয়াই তাকে ইংরাজী শিখাইতে আরম্ভ করিব।

সুরেন্দ্র। বাঙ্গালা জানে নাকি?

সুরেশ। ইস্‌রে !!—তাও কি তুমি জান না? সে যে বেথুন স্কুলে বাঙ্গালা পরীক্ষা দিয়ে, সে দিন ফুল কাঁটা প্রভৃতি পুরস্কার পেয়েচে।

সুরেন্দ্র। ওয়েল্ মাই ডিয়ার! তার নাম কি জান?

সুরেশ। দ্যাখ ভাই সে যেরূপ সুন্দরী নামটী কিন্তু সেরূপ নয়—নামটা শুনিতে বড় বদ।

সুরেন্দ্র। পাঁচী না কি?

সুরেশ। তা হলেও কতক ভাল ছিল।

সুরেন্দ্র। তবে কি?

সুরেশ। শুন্‌বি ভাই—ক্যাড়ানী, এই নামটাতেই বড় গোল করেচে; তা না হলে সমস্তই ভাল।

সুরেন্দ্র। তুমি ভাই বড় পাগল; সুন্দরী হলেই হলো, নামে আর কি যায় আসে।

সুরেশ। তা ভাই যাই হোক্ বিয়ে হলে আমি ভাই তাকে হয় নিতম্বিনী না হয় কাদম্বরী বলে ডাক্‌ব এবং চিটীর শিরোনামায় ঐ নাম দিয়ে প্রত্যহ এক খানা ক'রে চিটী

লিখিব তা হলেই ক্রমে ক্যাড়ানী নাম ডুবে গিয়ে ঐ নাম বহুল হইয়া উঠিবে।

সুরেন্দ্র। তবে ভাই তুমি তারে নিশ্চয়ই ইংরাজী পড়াবে।

সুরেশ। হাঁ তাতে আর সন্দেহ কি? বাবা খুড়ার মত পরিবার গুলাকে কোণে রেখে রেখে কুণো ব্যাঙের মত করিয়া একেবারে মরিচা ধরিয়ে ফেলিব না কি? আমি তা কখনই করিব না, এবং কাহারো কথা শুনিব না—ড্যাম্ দি কষ্টম্! আমি তারে কাঁচলী পরাব, পাঁচটা সভায় সঙ্গে করে নিয়ে যাব। মহাত্মা শিবনাথ শাস্ত্রী ও নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতি বড় বড় বক্তার বক্তৃতা শুনাইয়া আরো সভ্যতা আঁটিয়া দিব। আমি ভাই হাত পাঁচ ছয় ঘোমটার ভিতর রাখিয়া, পোকা ভাবান করিয়া ভাবিয়া মারিতে পারিব না। এতে ভাই যে যা কত্তে পারে করিবে।

সুরেন্দ্র। আচ্ছা ভাই ও রকম করিলে পাড়ার পাঁচজন বুড়ো জুটে যদি তোমার বাবাকে এক-ঘোরে করে তখন কি করিবে?

সুরেশ। ও মাইডিয়ার! তাতে কি আমি ডরাই. আমি আর বৎসর নিশ্চয়ই বি, এ পাশ করিব; আপাতত তিনশ টাকা না হউক, দুশ টাকা বেতন ত হবেই হবে, তখন না হয় ওয়াইফকে নিয়ে বেরিয়ে পোড়্‌ব এবং ভাল একটা বাড়ী ভাড়া করে সেইখানে পরম সুখে কাল যাপন করিব।

সুরেন্দ্র। তবে তুমি পারিবে; আচ্ছা সুরেশ তোমার সঙ্গেত ভাই এত আলাপ তোমার বিয়ে হলে তোমার ওয়াইফ্‌কে ভাল করে দেখাবে ত?

সুরেশ। ও ইয়েশ্ তা আবার বোল্চ? এক সঙ্গে বোসে তাস্ পর্য্যন্ত খেলিব, এখন কি আর সে কাল আছে? ড্যাম্ দি ওল্ড কষ্টম্!

সুরেন্দ্র। আচ্ছা ভাই, বাপ মার অমতে পরিবার নিয়ে আলাদা বাসা করিলে, লোকে যদি নিন্দা করে তখন কি করিবে?

সুরেশ। নিন্দা করিবে কেন? কারু খাই না পরি; না কোন বেটার পাঁচীরে এক্‌চালা দিয়ে বাস করি; আমার যা ইচ্ছা তাই করিব; যদি কেউ না বুঝে ট্যা ফোঁ করে তা হলে তৎক্ষণাৎ কেচ্ এনে তার ভিটেচাটী উড়িয়ে দেব জান না? এখন কি আর সে কাল আছে যে কেউ কিছু বোলে পার পাবেন। আমি কি আর সে কেলে লোক? না সে কেলেরীতিতে চলে থাকি। ড্যাম দি ওল্ড কষ্টম্! এখন ইংরাজী বিদ্যার বলে দেশের অবস্থা কত ফিরেচে, তা কি দেখ্‌চ না? আগেকার রীতিনীতি গুলা সব কুসংস্কারে পোরা—এই যে আমার বাবা কালীপূজা করেন, রোজ রোজ হোম করে কোটা কাটেন, একাদশীতে নির্জ্জলা উপবাস করেন, কোই এ পর্য্যন্ত তাঁরত দুখান হাত ঘুচে চারিখানা হলো না এবং আমরা যে হোটেলে গিয়া ষাঁড়ের ডাল্‌না দিয়ে রুটি খাই তাতেই কি আমাদের একখানা হাত খসে গিয়েচে? ও সব কথা রেখে দাও—আমরা কাহারো কোন কথাও শুনিব না কোন ভাইকে গ্রাহ্যও করিব না—ড্যাম্ দি ওল্ড কষ্টম্!

সুরেন্দ্র। আচ্ছা ভাই বিয়েত আগে হোক্ তখন দেখা

যাবে কত দূর করিয়া উঠিতে পার। আজি তবে ভাই চল্লেম্ এই বলিয়া সুরেন্দ্র প্রস্থান করিল, সুরেশও আস্তে আস্তে বাড়ী গিয়া ঐ বিবাহের বিষয় মনের মধ্যে তোলা পাড়া করিতে লাগিল।

চতুর্থ কাটি।

একমেটে সরস্বতী ও তাঁহার পুত্রদ্বয়।

এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আজি কালি লেখাপড়ার বড়ই চর্চ্চা হয়েচে। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে স্কুল ও পাঠশালা—পাঠশালার কাণ্ড কারখানা দেখে গুরু মহাশয়-দিগের মৃতপ্রায় আশালতায় আবার ক্রমে ক্রমে অঙ্কুর বাহির হইতে আরম্ভ হয়েছে।

গবর্ণমেন্ট আগে না বুঝিতে পারিয়া ম্যালা মাইরি উঁচুদরের স্কুল খুলিয়া দিলেন, চারিদিকে সরকারি সাহায্যের ছড়াছড়ি লাগিয়া গেল; তার পর যখন দেখিলেন যে দেশশুদ্ধ বাঙ্গালীর ছেলে লেখা পড়া শিখে ক্রমে তেজাল হইতে লাগিল, বিএ, এমএ, ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ষ্টুডেন্টসিপ্ প্রভৃতি পাশ করিয়া দেশ মাথায় করিয়া তুলিল এবং অবশেষে বেটারা বিলাত গিয়া সিবিল হইয়া আসিতে লাগিল ও চারিদিক্ থেকে কিল্‌বিল্ করে খবরের কাগজ দেখা দিতে সুরু করিল। এই সকল কাণ্ড কারখানা দেখে শুনে গবর্ণমেন্টের মনে কিছু আশঙ্কা হইল; তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া জন কতক বড় বড় ইংরাজ সভা করিয়া, প্রাইমারি এডুকেশনের সৃষ্টি করিলেন ও সেই সঙ্গে উচ্চশিক্ষার রসনায় একটি আল্‌পিন বিঁধিয়া রেখে দিলেন। এদিকে গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে ম্যালা-মেলি পাঠশালা বসিতে লাগিল, পুরাতন গুরু গুলা যেন হাতে

আকাশের চাঁদ প্রাপ্ত হইল, এই সময়েই ডাইরেক্টর মহাত্মা গবর্ণমেণ্টের সূক্ষ্ম মন্ত্রণায় গুরু ট্রেনিং স্কুলের সৃষ্টি করিলেন।

যে সকল রাড় দেশীয় আগুরি গুরু প্রাট্ সাহেবের স্কুলের ভয়ে, পাঠশালা ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিয়াছিল, তাহারা কৃপালু গবর্ণমেণ্টের কৃপায় আবার লাঙ্গল ছাড়িয়া গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে দেদার পাঠশালা খুলিতে লাগিল ; এই ব্যাপার দেখিয়া, বটতলার একমেটে সরস্বতীর আনন্দের আর পরিসীমা থাকিল না। তিনি আনন্দে আটখানা হয়ে দুইটী সন্তান প্রসব করিয়া বড়টীকে বলিলেন "যাও বাপু তুমি গিয়া সব ইন্‌চ্‌পেক্টর হও"। আর ছোটটীকে বলিলেন "তুমি বাপু সার্কেল গুরু হয়ে গ্রামে গ্রামে গিয়া ঘুরিয়া বেড়াও"।

কমলবনবাসিনী সেই বীণা-বাদিনী দিদির বড় অহঙ্কারটা হয়েচে, আজি সেই অহঙ্কার চূর্ণ করিব, যাও তোমরা গিয়া বেশ করে কাজ আরম্ভ কর কাহাকেও ভয় করিও না ; আমি দিন কতক একটু গা ঢাকা থেকে কতকগুলা এমনি গ্রন্থকার ও কবি বাহির করিয়া দেব যে বীণাবাদিনী দিদির সৃষ্ট গ্রন্থকার গুলা মাথা তুলিয়া আর কথাটী কহিতে পারিবে না।

হ্যাদে দেখ বাপু মাইকেল, বঙ্কিম, হেমা ও নবনে প্রভৃতি বীণাবাদিনী দিদির ছেলেগুলা দিনকতক আমার পেছনে বড়ই লেগেছিল, হ্যাদে অক্ষয় সরকারটা আজিও লাগিয়া রয়েচে--তোমরা গিয়া খুব খাটিতে থাক, মাসতুতো ভাই বলিয়া একটুও চক্ষুলজ্জা করিও না—গুরুগুলাকে মাঝে মাঝে দুটো চাট্টে পয়সা দিয়ে খুব উৎসাহ বাড়াইতে আরম্ভ কর। ছেলে গুলো যে পাঠশালা থেকে বাহির হবে আমি অমনি

তাহাদিগকে গ্রন্থকর্ত্তা করে একেবারে দেশ পয়মন্ত করে ফেলিব হয়েছে কি?

তোমরা হয়ত ভাব্‌চ যে কেবল নাটককার প্রভৃতি কতক-গুলি গ্রন্থকারের সৃষ্টি করিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিব? ইহা মনেও করিও না। হাজার হাজার কবির ও অগুন্তি সম্পাদকের সৃষ্টি করিয়া তবে ক্ষান্ত হইব, তার পর দেশ টল্‌মল্‌ করে কি না দেখিও—এই মাত্র বলিয়া একমেটে সরস্বতী অন্তর্ধান করিলেন।

বটতলার একমেটে মা এইরূপে গা ঢাকা হলে, সার্কেল গুরু ও সব ইন্‌চ্‌পেক্টর দাদা খুব আড়ে হাতে লাগিয়া গেলেন, গুরুদেবের এক তালি দেওয়া ছাতি ও ঠন্‌ঠনি-য়ার একযোড়া খুব মজবুত সম্পমাত্র সম্বল, এবং সব্‌ ইন্‌চ্‌-পেক্টরের এক বেতো ঘোড়া পুঁজি-এই দুয়ের বলে ইঁহারা টো টো করে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, পেটি প্রাইমারি প্রভৃতি নানাবিধ পরীক্ষার সৃষ্টি করিয়া দেশের গুরু গুলাকে ক্ষিপ্ত প্রায় করিয়া তুলিলেন।

গুরুগুলা কিরূপ শিক্ষা দিতেছে এইটী দেখিবার জন্য সব্‌ ইন্‌চ্‌পেক্টর মাঝে মাঝে খোঁয়াড়ের মত একটা ঘেরা জায়গার মধ্যে দেশের ছেলে পূরিয়া পরীক্ষা করিতে সুরু করিলেন। দয়ালু গবর্ণমেণ্টের এদিকে বড় নজর, কারণ পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলে গুলা দুই চারি পয়সা করিয়া নগদ্‌ বিদায় পাইয়া থাকে।

ইহাত গেল ছেলেদের প্রাপ্য পয়সা, ইহার উপর আবার গুরুদেবদিগের পুরস্কার আছে। যে গুরুর যত গুলা ছেলে

পাশ হইবে সেই গুরু তত টাকা বক্‌সিস পাইবেন। ইহাতে প্রতি বৎসর কেহ ৩০ কেহ ৪০ কেহ কেহ বা ৫০ টাকাও পাইতে লাগিলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য পাঠশালায় চারিদিক্ ক্রমে ক্রমে ছাইয়া পড়িল। এদিকে তলে তলে মা একমেটে সরস্বতী মেলা গ্রন্থকর্ত্তার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

রামা, কেষ্টা, ফকুরে, পেঁচো হাদে বৃষভানু নন্দিনী বাঁটুয্যে প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থকার জন্মিয়া মেলা মাইরি পুস্তক বাহির করিতে লাগিল, কলিকাতার ছাপাখানাগুলাও বেশ চলিতে লাগিল ও কাগজ বিক্রেতাদিগের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

উক্ত গ্রন্থকারদিগের মধ্যে ফকিরচাঁদ এক খানি নাটক প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াই নির্জনস্থানে গিয়া বসিলেন। তাঁহার সে গম্ভীর ভাব ও মুদ্রিত নয়ন দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে সাক্ষাৎ বেদব্যাস যেন বেদ বিভাগ করিবার জন্য ধ্যানে বসিয়া গিয়াছেন।

বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, তখনও ফকির-চাঁদ সেই নির্জন ঘরে বসিয়া ভাবিতেছেন ও মাঝে মাঝে কি লিখিতেছেন, এই ব্যাপার দেখিয়া ফকিরের মাতা গিয়া বলিলেন "ও ফকির"—উত্তর নাই। আবার ফকির বলিয়া ডাকিলেন, সে বারেও উত্তর পাইলেন না; তখন রাগ করে বলিলেন "আ মর্ ড্যাক্‌রা—অমন করে গালে হাত দিয়ে কি ভাব্‌চিস্? ভাত যে একেবারে শুকিয়ে গেল।" এই কথা শুনে ফকির চাঁদ নয়ন খুলিয়া বলিলেন "মা আমি যে স্নান আহার পরিত্যাগ করিয়া কি জন্যে চোক বুজে বসে আছি

তার মর্ম্ম তুমি কি বুঝিবে, আমি গ্রন্থকার হইচি তা কি তুমি জান? যাও আমাকে অমন করে আর বিরক্ত করিও না, আমার যখন ইচ্ছা হবে তখন গিয়া খাব।"

এই ভাবে দিন কতক গেলে ফকির মাথাটী কামাইলেন ও তদুপরি একখানি জলের পটী বসাইয়া বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন "গ্রন্থের ভাব ভেবে ভেবে মাথা বড় গরম হয়েচে সর্ব্বদাই প্রায় বন্ বন্ করে ঘোরে তাই ডাক্তারের পরামর্শে জলের পটী বসান গিয়াছে, তোমরা ভাই কি বুঝিবে আমার যা হয়েচে তা আমিই জানি।"

এই ভাবে আরো দিন কতক গত হইলে তাঁহার লেখনী হইতে কুমুদ্বতী নামক একখানি নাটক বাহির হইল। যে দিন নাটকের পাণ্ডুলেখ্য শেষ হইল সেই দিন ফকিরচাঁদ তাঁর ধর্ম্ম পত্নীর নিকটে বসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "সেই নাটক খান আজি সমাপ্ত হইয়াছে এখন ছাপাইতে পারিলেই দুই সপ্তাহের মধ্যে ২০০০ টাকা ঘরে উঠিবে। আগে তোমার ডায়মন্ টাকা তাবিজ ও ডায়মন্ কাটা যশম প্রস্তুত হইবে তার পর বৈটকখানার ঘরটা ভাল করে করা যাইবে। এবং দ্বিতীয় তৃতীয় সংস্করণের টাকায় তোমার নামে কোম্পানীর কাগজ করা যাইবে।"

এই কথা শুনিয়া ফকিরচাঁদের স্ত্রী বলিল, "আচ্ছা আপাততঃ ছাপাইতে কত টাকা লাগিবে?"

ফকির। প্রায় ৩০০ টাকা।

স্ত্রী। একেত আমাদের এই দুর্দ্দশা, তুমি একে বারে অত টাকা কোথায় পাইবে?

ফকির। কেন? তোমার বালা, মল্ ও পাঁচনর গাছা দাও না কেন? এর পর একেবারে ঝুড়ী করে টাকা এনে দেব, তখন টাকা তুলিয়া শেষ করিতে পারিবে না।

ফকিরের স্ত্রী সরল হৃদয়া রমণী, সে ভাবিল হতেও পারে; এইটী ভাবিয়া গহনা গুলি খুলিয়া দিল। ফকিরচাঁদ তৎক্ষণাৎ গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া প্রেসে গিয়া পুস্তক খানি দিলেন। ক্রমে প্রুফ্‌সিট্ আসিতে আরম্ভ করিল ফকির সেই প্রুফ্ হাতে করে এর কাছে তার কাছে পড়িতে লাগিলেন ও খুব বুক ফুলাইয়া বেড়াতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে পুস্তক বাহির হইল। ফকিরচাঁদ আত্মীয় বন্ধু বান্ধব যাকে পান ধরে ধরে পুস্তক গতাইতে লাগিলেন। তার পর দিন কতক পরে যার কাছে দাম চান সেই বলে দাম দিতে হবে জানিলে, কোন ভেড়ো তোমার অমন বই কিনিত।" ঐ তোমার বই পোড়ে আছে ইচ্ছা হয় ত নিয়ে যাও। ফকির গতিক ভাল নহে দেখিয়া সেই সকল বহি একত্র করিয়া, সংস্কৃত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ চণ্ডীবাবুর নিকটে গিয়া দিলেন। চণ্ডীবাবুর ইচ্ছা না থাকিলেও কেবল চক্ষুলজ্জার খাতিরে ফকির চাঁদের নাটক গুলি রাখিয়া দিলেন।

প্রায় এক বৎসর পরে ফকির চাঁদ এক দিন চণ্ডীবাবুর কাছে গিয়া বলিলেন "মহাশয়! আমার হিসাবে কত টাকা পাওনা হয়েচে? এক বার ভাল করিয়া খাতা খানা দেখুন দেখি।"

চণ্ডীবাবু খাতা দেখে বলিলেন "কৈ এ পর্য্যন্ত ত, এক খানিও বিক্রয় হয় নাই কেবল মুটে ভাড়ার দরুন ও কাপি

খরচার দরুন আমরা ৭৷৶ পাইব; যদি এনে থাকেন তবে দিয়া যান।"

এই কথা শুনিয়াই ফকিরচাঁদের চক্ষু স্থির হয়ে আসিল। তখন তিনি বলিলেন "আচ্ছা কল্য টাকা এনে দেব।" এই কথা শুনিয়াই পিট্‌টান দিলেন আর সে মুখো হলেন না। পুস্তক গুলা ক্রমে পোকায় কাটিতে লাগিল। ইহার মধ্যে এক দিন গহনাগুলি চেয়ে ফকিরের স্ত্রী তিন চারিটা ঘুসাও খাইয়াছিল, সে সব বিষয় আর এখানে বর্ণনীয় নহে।

এই কাণ্ড কারখানার পর বাঙ্গালা স্কুলের ছাত্রবৃত্তি পাওলা ও মা একমেটে সরস্বতীর পোষ্য পুত্র বীরেশ্বর রায় পদ্যশুঁড়ী নামক এক খানি কাব্য প্রস্তুত করিয়া, একে তাকে দেখাইতে লাগিলেন। সকলেই বলে "হাঁ বড় মন্দ হয় নাই।"

বীরেশ্বর বাবু ডেপুটী ইনচ্‌পেক্টরের শালা বলিয়া, পুস্তক খান ধাঁ করে ছাপাইয়া ফেলিলেন; দেশীয় সংবাদ পত্রে কেবল বীরুকে বাপান্ত করিল না, আর সমস্তই বলিল। বীরু বাবু মহা বিপদে পড়িয়া, দিদির কাছে গিয়া কেঁদে বলিলেন "দিদি আমার পদ্যশুঁড়ী খানার একটা কোন উপায় না করিলে, আমি গলায় দড়ী দিয়ে মরিব; লোকে কত কথা বোলচে—কেহ বলে পদ্যশুঁড়ী পোকায় কাটিবে, কেহ বলে পদ্যশুঁড়ীতে মসলা বাঁধা হবে, হ্যাদে পাড়ার বেটারা বলে পদ্যশুঁড়ি চিরিয়া তক্তা হবে; বাবু থাকিতে আমার এই দুর্দ্দশা?"

বীরু বাবুর দিদি বলিলেন "আচ্ছা তুই কাঁদিস নে, বাবু এলেই আমি বলিব এখনি। লোকের এত আমের শুঁড়ী

তেঁতুলের গুঁড়ী বিক্রী হয়, তোর পদ্যগুঁড়ী খানা কি আর অবিক্রী থাকিবে? তুই নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্, বাবু এলেই যা হয় একটা উপায় করে দেব এখনি।”

বীরু, দিদির প্রবোধ বাক্যে সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলে, খানিক পরেই বাবু এলেন। অমনি বীরুর দিদি জল খাবারের রেকাব আর জলের গেলাস হাতে কারে তাড়াতাড়ি কাছে এসে বসিলেন।

বাবু জল খেতে আরম্ভ করিলেন এই অবকাশে গিন্নী গল্প তুলে বল্লেন “বলি তোমরা হলে মুলুক শুদ্ধ স্কুলের কর্ত্তা, বীরুর বহি খানা চালিয়ে না দিলে বীরুর বড় ক্ষতি হয়—বীরু বড় দুঃখিত হয়েচে, ও বেলা ভাল করে ভাত পর্য্যন্ত খায়নি।”

বাবু স্ত্রীর কথা এড়াতে না পেরে বলিলেন ‘আচ্ছা দেখা যাবে, তবে কি জান ওসকল বহি চালাইলে বড় নিন্দা হয়— আচ্ছা হয় হবে, তুমি যখন অনুরোধ কোচ্চ তখন একটা উপায় কত্তেই হবে।’

পাঠক! বীরুর কপাল ভাল; তার পর বীরুর ভগিনী-পতি খোদ কলিকাতায় গিয়া, ইন্‌চ্‌পেক্টর সাহেবের দ্বারা ডাইরেক্টরের এক সারকুলার চিটী বাহির করিয়া লইলেন। তাহাতে এই রূপ লেখা থাকিল—“এই পদ্যগুঁড়ী খানা ভারতবর্ষের অবশ্য পাঠ্য, ইহা না পড়িলে কেহ পরীক্ষা দিতে পারিবেন না।” সারকুলার ন ১৪৬।

তার পরেই বীরু বাবু কাগজে এই রূপ বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিলেন। “ডাইরেক্টর সাহেবের ১৪৬ নং সার-কুলার অনুসারে আমার এই পদ্যগুঁড়ী ভারতবর্ষের অবশ্য-

পাঠ্য, অধিকন্তু যাঁহারা লেখা পড়ার ব্যবসায় না করেন তাঁহারা যদি ইহা কিনিয়া ঘরে রাখেন তাহা হইলে ঘরের ছারপোকা ও আর্সুলা সমস্ত মরিয়া যাইবে, মূল্য ।/ পাঁচ আনা মাত্র।"

এই রূপে এক মেটে সরস্বতীর কতকগুলা ছেলে মেলা যাইরি গ্রন্থকর্ত্তা হয়ে দেদার বহি বাহির করিতে লাগিল কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ যে মশা ও ওয়ানীর মত পাঁচ মিনিটের মধ্যে লীলা সংবরণ করিতে লাগিল সে দিকে কাহারো দৃষ্টি রহিল না।

ঐ সকল গ্রন্থকারের মধ্যে যাহারা নীকর ন্যায় ডেপুটী ইনস্‌পেক্টরের শালা, কি খোদ ইনস্‌পেক্টরের মিন্‌ক্ প্রকিওরার কেবল তাহাদেরই পুস্তক স্কুলের পাঠ্য হইল, আর বাকি গুলা খুব ভাল পুস্তক হইলেও মশামাচীর ন্যায় মরিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া মা একমেটে সরস্বতী, এলো মেলো গন্ধর্ব্বরূপী সম্পাদকের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

এই ব্যাপারে মা বীণা-বাদিনীর সৃষ্ট সম্পাদকগুলি কিছু ভয় পাইলেন দেখিয়া বীণাবাদিনী বঙ্গবাসী, অক্ষয় ও গঙ্গাধরকে বলিলেন, ভয় কি বাবা—তোমাদের মাসতুতো ভাইগুলার কার্য্য দেখে ভয় পেয়েছ; ভয় কি? উহারা তোমাদের কিছুই করিতে পারিবে না, তোমরা নির্ভয়ে কাজ করিতে আরম্ভ কর। উহাদের জীবন মশা মাচীর ন্যায়, ক্ষণস্থায়ী—যে হবে সেই মরিবে। তোমরা কিন্তু হাল ছাড়িয়া দিও না। এই বলিয়া বীণাবাদিনী কমলবনে গমন করিলেন।

পঞ্চম কাটি।

পেট্যাণ্ট মেডিসিন্।

যদিও গাছ গাছড়া প্রভৃতির গুণাগুণ বিভাগ করিয়া ভগবান্ ত্রিপুরারি তন্ত্র শাস্ত্রে ও আগম নিগমে নানা প্রকার ঔষধের কথা লিখিয়া জীবের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি চরক, সুশ্রুত, বাভট প্রভৃতি ঋষিগণও নানা প্রকার ঔষধ ও পাচনের আবিষ্কার করিয়া দেশের কত উপকার করিয়া যান নাই। ঐ সকল মুনি ঋষি যদি পয়সা পাইবার প্রত্যাশায় ঔষধ প্রস্তুত করিতেন তাহা হইলে বনে থাকিয়া তাঁহাদিগকে আর মালায় করিয়া জল পান করিতে হইত না, সোণার করঙ্গ হাতে করিয়া বেড়াইতে পারিতেন।

ঐ সকল ঋষি বনে থাকিতেন এই জন্য নানা প্রকার ফল মূল ও গুল্ম লতার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া, কেবল জীবের উপকারের জন্য বিবধ প্রকার মহৌষধের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর কতকগুলি যুবক ঐ সকল মুনি ঋষিদিগের উপর টেক্কা দিয়া চলিতেছেন।

এই মহাত্মারা পয়সার জ্বালায় ও অভাবের কামড়ে অস্থির হইয়া নানা প্রকার ঘরকোটালি নূতন নাম সঙ্কলন পূর্ব্বক কত অব্যর্থ মহৌষধের যে সৃষ্টি করিতেছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কোটি প্রকার উপায় সত্ত্বেও কৌশল দ্বারা পয়সা উপার্জ্জনই ইহাঁদের জীবিকা হইয়া উঠিয়াছে।

ধন্বন্তরি, সুষেণ, কি অশ্বিনীকুমারদ্বয় যদি আজি পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিতেন, তাহা হইলে এই মহাত্মারা নিশ্চয়ই তাহাদিগের গালে চূণ কালী দিয়া ছাড়িয়া দিতেন ; ছি ছি লেখা পড়া শিক্ষা করিয়াও এমন কুরুচি !

ইহাদের কথা আর কত বলিব। এই দেশহিতৈষী মহাত্মারা পয়সার খ্যাচ্‌কায় অস্থির হইয়া সম্বাদ পত্রের স্তম্ভে দেদার বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেহ কেহ বিজ্ঞাপনে বলিতেছেন, "ওগো একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ।" কেহ বলিতেছেন, "ওগো তোমরা আমার এই জ্বরকুঞ্জর পারীন্দ্র বটিকা প্যাকিং চার্জ সহিত ৪৷ টাকা দিয়া একবার কিনিয়া দেখ, যদি রোগ না সারে তবে কাণমলা খাইব।"

ত্রাণ্ডীচরণ শর্ম্মা নামক এক মহাত্মা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, "প্যাকিংসহ ৭৷৷ টাকা দিয়া আমার এই ঔষধ এক বোতল সেবন করিলে, নিশ্চয়ই মহারোগ সারিবে," কি আশ্চর্য্য এ পর্য্যন্ত যে মহারোগের ঔষধের আবিষ্কার হইল না, লোকে বলে স্বয়ং মহাদেব চিকিৎসা করিলেও মহারোগের শান্তি হয় না, নির্লজ্জ ত্রাণ্ডীচরণ আজি সেই রোগ আরাম করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছেন।

কোন কোন মহাত্মা সর্ব্বরোগান্তকারিণী তৈলের আবিষ্কার করিয়া বলিতেছেন, "হে বঙ্গবাসিগণ! আমার এই তৈল একশিশি কিনিয়া, ইহার গুণাগুণ একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। ইহাতে মস্তিষ্ক শীতল করিবে, মেধাশক্তি বাড়াইবে, শরীরের তেজঃ ও বীর্য্য বৃদ্ধি করিবে, এবং বলি

মাখিবেন তাঁহার সাতপুরুষ পর্য্যন্ত চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইবে না।

ইহাত গেল তৈল ও মহৌষধের কথা; ইহার উপর আবার নানাপ্রকার সন্ন্যাসীর মাদুলি বাহির হইতেছে। যেমন গোদের উপর বিষফোড়া, কুড়ির উপর আমবাত, সেইরূপ অব্যর্থ মহৌষধের উপর এই সন্ন্যাসিদত্ত মাদুলি। এই মাদুলির মধ্যে কোনটার দাম ৫ আনা কোনটার দক্ষিণা বা ১৲ টাকা। ইহা কিনিয়া যিনি গলায় পরিবেন, তিনি অতি ত্বরায় জ্বর, প্লীহা, গোদ, গলগণ্ড, উদরাময়, যকৃৎ, শকৃৎ, শীর্ষ, দোষ, স্বশ্চভিশ্চ্‌শাৎ, কুঁজ, কোরন্দ, শিরঃশূল, অম্লশূল, দৃষ্টিবৈষম্য, ছানি, একশিরা, দোশিরা, ও তেশিরা প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবেন।

পাঠক! এই সকল ব্যাপার দেখিয়া আমি একখানি নূতন কবচের আবিষ্কার করিয়াছি, ইহার নাম যক্ষ্মান্তকৃৎ কবচ, ইহা গলায় পরিলে, ক্ষয় কাশ ও রাজযক্ষ্মা নিশ্চয়ই আরাম হইবে, যদি রোগ না সারে তবে ছয়মাস পরে সুদ সহিতে টাকা ফেরত দিব।

আমার এই কবচ বৈদ্যুতিক উপকরণে প্রস্তুত, যদি পরীক্ষা করিতে চান তবে আমার এই কবচ কিনিয়া নাকের রন্ধ্রের মধ্যে ইহার কিয়দংশ প্রবেশ করিয়ে দিবেন যদি হাঁচি হয় তবে জানিবেন যে একবচের অনেক গুণ আছে, আর যদি হাঁচি না হয় তবে তৎক্ষণাৎ কবচ পরিত্যাগ করিবেন আমি মাথায় করে মূল্য ফেরত দিয়ে আসিব।

আমার এই কবচ কিনিয়া, যাঁহারা পরিধান করিবেন তাঁহাদিগকে আমি গুটিকতক উপদেশ দিয়া রাখি, সেই কথাগুলি তাঁহারা মনে করিয়া রাখিলে, তাঁহারা বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবেন।

প্রথম উপদেশ। যখন মেঘ ডাকিয়া আকাশে বিদ্যুৎ খেলিবে, তখন যেন আমার প্রকাশিত এই কবচধারী কবচখানি খুলিয়া রাখেন তা না রাখিলে, কবচ গলা হইতে ছুটিয়া আকাশে উঠিবে ও মেঘের সহিত মিশিয়া যাইবে। তখন কবচধারী বোকার মত হা করিয়া থাকিবেন।

দ্বিতীয়। কবচের সহিত একগাছি খুব সরু গোচের লোহার তার বাঁধিয়া যেন পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখা হয়, তা না করিলে মহা বিভ্রাট্ উপস্থিত হইবে বিদ্যুতের আগুণে কোন দিন শরীর ঝলসিয়া যাইবে। ইহারই নাম ওয়াটার লাইন্।

তৃতীয়। এখন ভারতবর্ষের নানাস্থানে রেলওয়ে হইয়াছে, যেখানে রেল্ওয়ে ষ্টেসন্ সেইখানেই টেলিগ্রাফের আপিস; এজন্য আমার এই কবচধারীকে বলা যাইতেছে যে, তিনি যেন কবচ গলায় দিয়া টেলিগ্রাফের ঘরে গিয়া না ঢোকেন, কারণ সেদিন পরীক্ষা দেখিবার জন্য আমি নিজে আমার এই কবচ গলায় পরিয়া, রাণাঘাটের টেলিগ্রাফ আপিসে ঢুকিয়াছিলাম, এমন সময়ে ব্যাটারির বাটীগুলি নড়িতে লাগিল ও ক্রমে আমার গলায় টান পড়িতে আরম্ভ হইল; তখন টেলিগ্রাফ্ মাষ্টার বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার কিকির কাকার করিয়া, নানা কৌশলে

তবে আমাকে কোন রূপে বাঁচিয়ে দিলেন। আমি বেরিয়ে এলে তিনি আমায় বলিলেন "তুমি আর খানিক ক্ষণ ঘরের মধ্যে থাকিলে, টেলিগ্রাফের তার মার ছিঁড়ে ছুটে যাইচ্ছে তাই হোতো; এজন্য সর্ব্বসাধারণকে বলিতেছি যে আমার এই কবচ পরিয়া যেন কেহ টেলিগ্রাফের ঘরে গিয়া না বসেন।

চতুর্থ। এই কবচ গলায় দিয়া কেহ যেন গ্যাল্‌বাণিক্ ব্যাটারি না ধরেন, ধরিলে আর ছাড়িতে পারিবেন না, ব্যাটারির হ্যাণ্ডেল হাতে আটার মত নেপ্‌টিয়া যাবে তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়িবে। এই কটি কথা বলিয়া দিয়ে আমি লোকজনকে সতর্ক করিয়া দিলাম ইহা না করিলে, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অননুষ্ঠান জন্য আমাকেই পাপে লিপ্ত হইতে হইবে এইজন্য উপদেশ কটি সাধারণের গোচর করিয়া রাখিলাম।

যদি কেহ বলেন যে "তোমার এই নবাবিষ্কৃত যন্মান্ত-কৃৎ কবচ লোকে হঠাৎ পয়সা দিয়ে কিনিবে কেন? তুমি কেন এমন কবচের সৃষ্টি করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলে?" আমি বলি যে কোন মতেই ঠকিব না, যে দেশে আমাদের বাস সে দেশে অনেক বোকা আছে, সেই বোকাগুলো যদি মেতে ওঠে তা হলেই আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিব; ইহাতে যদি বিশ্বাস না হয় তবে একটা বোকার তালিকা এইখানে দিচ্চি সকলে অনুভব করিয়া দেখুন তা হলেই বুঝিতে পারিবেন এখনি।

আমাদের এই বঙ্গদেশে সাতকোটি লোকের বাস তার

মধ্যে ৪ কোটির পীড়া নাই বেশ সুস্থকায়, এক কোটি বালক বালিকা, এক কোটি লেখাপড়ায় খুব তুখড় আর অবশিষ্ট এক কোটির মধ্যে ৫০ লক্ষ পাগল অন্ধ ও জড় তার পর বাঁকি ৫০ লক্ষ যদি বোকা হয় তা হলেই আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিব, অতএব যাঁহারা বলেন যে আমি মৎপ্রণীত কবচ বেচিয়া টাকা পাব না তাঁহাদের ভূল।

ষষ্ঠ কাটি।

বঙ্গীয় হুজুগ।

লোকে বলে বাবা ইহা উনবিংশ শতাব্দী, একালে আর আগেকার মত তত জারি জুরি খাটে না, এই কথা সকল লোকের মুখেই শুনিতে পাই, সকলেই সেয়ানা, সকলেই বুদ্ধিমান্ কিন্তু আমি দেখচি যে অন্য কোন জারি জুরি খাটুক আর না খাটুক এখানে কোন একটা হুজুগ তুলিতে পারিলেই বেশ দশ টাকা হাতে করে বসিতে পারা যায়।

পঞ্চম কাটিতে যাহা বিবৃত করা হইয়াছে উহাত গেল অব্যর্থ মহৌষধের ও যক্ষাতকৃৎ কবচের কথা; আবার এক জন গণৎকার কোথায় কোন গুপ্ত পর্ব্বতের গুহায় কোন সন্ন্যাসীর কাছে গণনা শিক্ষা করিয়া হঠাৎ এই দেশে

আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং খুব হুজুগ তুলিয়া পয়সা ধরিবার নিমিত্ত বেশ একখানি খ্যাপলা জাল বিস্তার করিলেন। পুঁটি মাচের ন্যায় শিকি, আধুলি ও দুয়ানি প্রভৃতি লাফিয়ে লাফিয়ে এই জালে আসিয়া পড়িতে লাগিল। হুজুগে যুবকগণ এই হুজুগে মেতে একেবারে ধেই ধেই করে নেচে উঠিলেন, জ্যোতিষিক মহাশয় বেশ মজায় কাল কাটাইতে লাগিলেন।

আজি কালি হুজুগটা একটু থামিয়াছে, জ্যোতিষিক মহাশয় কিঞ্চিৎ টাকা কড়ি উদরসাৎ করিয়া কোথায় যে সরে পড়েছেন তার আর বড় খোজ খবর পাওয়া যাচ্চে না।

যাঁহারা হাত, পা, কপাল প্রভৃতি পুরুষের অঙ্গ দেখিয়া দশটাকা উপার্জ্জন করিবার পন্থা বাহির করেন তাঁহারা বড় কম লোক নহেন। আর যে সকল ক্ষীণ মস্তিষ্ক যুবক সেই হুজুগে মেতে সেই কথা ব্রহ্মজ্ঞান ক'রে পয়সা নিয়ে সেইখানে অঙ্গ দেখাইতে ধাবিত হন তাঁহারাও কম বোকা নহেন। যাহোক বঙ্গদেশকে ধন্য বলিতে হয়। ইহা যদি এত বোকাই না হবে তাহা হইলে রাজ্যচ্যুত হইয়া বিজিত জাতির মধ্যে গণ্য হবে কেন?

এদেশীয় লোক এমনি ক্ষীণ মস্তিষ্ক যে, যে যখন একটা কোন ফন্দি তুলিবে তাতে তৎক্ষণাৎ অমনি ঢলিয়া পড়িবে। আজি কালি বিজ্ঞাপনের বড় আদর হয়েচে বড় গৌরব বৃদ্ধি হয়েচে। একটা কোন কাণ্ডকারখানা করে কোন একটা হুজুগ তুলিতে পারিলেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়।

১২৮৭ শালে একজন ফকির কলিকাতায় আসিয়া জল-পড়ার হুজুগ তুলিলেন, অমনি বঙ্গদেশীয় বোকারা একেবারে যেন ক্ষেপে উঠিল। একটা মেটে ভাঁড় ও চাটি কেলে জিরে হাতে করে পিপিড়ার সারের মত লক্ষ লক্ষ লোক আসিতে লাগিল——প্রতিদিন চাঁদপালের ঘাটে এত হুড় হইতে লাগিল যে কার সাধ্য সে হুড় ঠেলিয়া প্রবেশ করে।

বহুতর লোকের সমাগম দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের পর্য্যন্ত সে দিকে নজর পড়িল, এমন কি লোক রক্ষার জন্য সারজন পর্য্যন্ত নিযুক্ত হইল, কিন্তু ফকিরের একটু মহত্ব ছিল, তিনি জল পড়িয়া দিয়া কাহার নিকট হইতে পয়সা গ্রহণ করেন নাই। এই হুজুগে তিনি যদি একটি করিয়া পয়সা গ্রহণ করিতেন তা হলেও লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিতে পারিতেন কিন্তু সেরূপ প্রণালীতে না চলিয়া তিনি খুব মহত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

আজি কালি বড় মজা লাগিয়া গিয়াছে; রাস্তায় বাহির হইলেই বিজ্ঞাপনের উৎপাত আসিয়া জোটে; রাস্তায় খানিকক্ষণ ঘুরিলেই বিজ্ঞাপনে পকেট পূর্ণ হইয়া যায়; গলির মোড়ে বিজ্ঞাপন, হাতে হাতে বিজ্ঞাপন, ট্রাম গাড়িতে বিজ্ঞাপন, মুটের কাঁদে বিজ্ঞাপন আর দিন কতক গেলে কলিকাতায় বিজ্ঞাপনের ফ্ল্যাগ্ উড়িতে থাকিবে; এই সব বিজ্ঞাপনের মধ্যে অধিকাংশই হুজুগে বিজ্ঞাপন।

আবার একটা বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণের বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে। এটায় সর্ব্বাপেক্ষা মজা আছে। কোন এক মহাত্মা এই বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলেন যথা—"আমি

প্রলাপিনী নামে একখানি নবন্যাস বাহির করিতেছি। ইহা বিনা মূল্যে বিতরণ করিব, যিনি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন তিনি যেন আগামি চৈত্র মাসের মধ্যে কেবল মাত্র ডাক-মাশুল ॥৵০ পাঠাইয়া দেন তা হলেই পুস্তক পাইবেন। আমার নবন্যাস দশখণ্ডে সমাপ্ত হইবে। যিনি অন্ততঃ বিশজন গ্রাহক জুটাইয়া দিতে পারিবেন তিনি বিনা ডাক-মাশুলে এক খানি পুস্তক পাইবেন।

পাঠক! দেখুন দেখি কি মজার বিজ্ঞাপন, যিনি বিনা মূল্যে পুস্তক বিতরণ করিবেন তঁহার আবার গ্রাহকের জন্য মাথা কামড়ানি কেন? এ হুজুগ মন্দ নহে।

হায় হায় কি হইল, দেশের লোকগুলা কি পাপে এত হুজুগে হয়ে উঠিল? পূর্ব্বতন আর্য্য সন্তানগণের সেই বিশুদ্ধ ও সরল ভাব, সেই অসাধারণ পাণ্ডিত্য, সেই আশ্চর্য্য দেশ-হিতৈষিতা, সেই চমৎকার ভাতৃভাব ও নিঃস্বার্থ পরোপ-কারিতা এখন কোথায় গমন করিল?

সূর্য্যসিদ্ধান্ত, ভাস্করাচার্য্য, মিহির ও কেরলি প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ জ্যোতিষ শাস্ত্রের যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সঙ্কেত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা কত টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন? মহাত্মা সায়নাচার্য্য চারি বেদের ভাষ্য প্রস্তুত না করিলে, হয় ত আজি পর্য্যন্ত কেহই নিগূঢ় বেদার্থের উদ্ভাবন করিতে পারিতেন না; তিনি সমস্ত পৃথিবীর এই অসদৃশ উপকার করিয়া কত টাকা উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন?

যে মহাভারতের উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া, এই দেশীয় শত সহস্র

লোক কাব্য নাটকাদি প্রণয়ন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করি-তেছেন সেই মহাভারত-প্রণেতা ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন শ্রীমদ্ভাগবত ও অষ্টাদশ মহাপুরাণ প্রস্তুত করিয়া কত টাকার অধিকারী হইয়াছিলেন? তাঁহার যে করঙ্গ কৌপীন ছিল তাহাই চিরকাল ছিল। করঙ্গ ঘুচিয়া কখন ঘ ঘটীয় নাই এবং কৌপীন ঘুচিয়া কখন বহির্বাস হয় নাই।

পাঠক মহাশয়! ইহারই নাম নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা, ইহারই নাম নিরভিসন্ধি দেশহিতৈষিতা। যাহাদের ঘটে কিছুই নাই ও যাহারা একটা না একটা ফেতরেজে মতলব ভাঁজিয়া দেশের লোকের চক্ষে ধুলা দিয়া পয়সা উপার্জ্জনের চেষ্টায় ফেরে তাহারাই এ সংসারের কলঙ্ক স্বরূপ। হে দেশীয় ভ্রাতৃগণ! তোমরা ভাই আর হুজুগে মাতিও না—যাহাতে দেশের হিতসাধন হয়, যাহাতে আপনারা শিশু-দিগকে উচ্চ শিক্ষা দিতে পার, যাহাতে মদ্যপান প্রভৃতি অতি কুৎসিত ব্যবহার দেশ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয়, যাহাতে দেশের লোকের অন্তঃকরণে স্বাধীন ব্যবসায়ের ভাব প্রস্ফু-রিত হইয়া হইয়া এঠে, কেবল সেই বিষয়ে যত্নশীল হও, হুজুকে মাতিয়া আর বোকামি প্রকাশ করিও না।

সপ্তম কাটি।

—০—

এ দেশের লোক গরিব কেন?

১৮৫৭ সালে শিপাইযুদ্ধ বাধিলে, ব্রিটিশ সিংহ প্রথমে কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া, শেষে অতুল বলবিক্রমের সহিত তাহাতে জয়লাভ করেন। তার পরেই দেশের লোককে সভ্য ও সুশিক্ষিত করিবার জন্য রাজ আজ্ঞা অনুসারে গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দয়ালু গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য দান করিতে লাগিলেন। এমন কি সাহায্য দান বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট একেবারে কল্পতরু হয়ে বসিলেন। গুটিকতক ছেলে লইয়া একটী সামান্য স্কুল করিতে পারিলেই অমনি রাজভাণ্ডার হইতে সাহায্য প্রাপ্তি। এইরূপে দেশের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ইংরাজীতে বাঙ্গালাতে বহুতর বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

এক দিকে হড্‌সন্ প্রাট্ সাহেব ইন্‌স্‌পেক্টর হইলেন, অন্য দিকে বাঙ্গালা মডেল্ স্কুলের পরিদর্শক হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কাজ চালাইতে লাগিলেন। ইহাতেও ভালরূপ চলে না দেখিয়া শেষে গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন ডেপুটী ইন্‌স্‌পেক্টর নিযুক্ত করিতে লাগিলেন; বড়ই ধুমধাম পড়িয়া গেল।

এই সকল ব্যাপার ও কাণ্ড কারখানা দেখে শুনে

গ্রাম্য গুরুমহাশয় গুলা একেবারে অবাক্। সকল ছেলেই স্কুলে যাইতে লাগিল, বেগুণে চ, কুকুর নেজা চ এ. সকল বোল্ চাল চলিয়া গেল। যেখানে যাই কেবল "কাটা কাণ" "কাটা শাণ", "মিঠাই খাইব" "কোথায় পাইব", এই সকল ছেলেদের মুখে শুনিতে লাগিলাম।

গোবিন্দ সামন্ত, নিধিরাম ভা, গণেশ যশ প্রভৃতি বর্দ্ধমানে আগুরি গুরুমহাশয়েরা একেবারে পাততাড়ি গুটাইয়া নিরুদ্দেশ হইলেন এবং দেশে গিয়া পুনর্ব্বার লাঙ্গল চালাইতে আরম্ভ করিলেন।

এই হিড়িকে ইংরাজী লেখাপড়ারও খুব উন্নতি হইয়া উঠিল। কলেজের জুনিয়ার সিনিয়ার ছাত্রবৃত্তি উঠিয়া গিয়া, সমস্ত দেশ মধ্যে উহা ছড়িয়ে পড়িল। এণ্ট্রান্স, এল্ এ, বি এ প্রভৃতি পরীক্ষার সৃষ্টি হইল। বাঙ্গালীর ছেলেগুলা ভয়ানক বুদ্ধিমান, ইহারা পটাপট্ বৃত্তি সহিত টাইটেল নিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে এম এ, বি এ কিলবিল্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল; কিন্তু সৎপথে থাকিয়া কিরূপে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, সে পথ কেহই দেখিতে পাইল না।

গবর্ণমেণ্ট ইহাদের চোক কাণ ফুটাইয়া দিলেন কিন্তু ইহারা যে দরিদ্র সেই দরিদ্রই থাকিয়া গেল; ইহারা ব্যবসা বাণিজ্য কিছুই বুঝিল না, কেবল চাকরি চাকরি করিয়া অস্থির হইয়া উঠিল।

আজি কাল কুড়ি টাকা বেতন দিব বলিলেই প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন এম এ, দু শ একশ বিএ জুটিয়া যায়; হায় হায়

কি দুর্দ্দশাই হইয়াছে, মরণ আর কি!! ছি ছি! অতি সামান্য বেতনে দাস হইতে ইহাদের এত অভিলাষ কেন? ইহারা যে ক্রমে ফকির হইয়া যাইতেছে সে দিকে কি কাহারো দৃষ্টি নাই।

স্বদেশের বস্ত্র গেল, স্বদেশের ঔষধ গেল, স্বদেশের কাগজ গেল, স্বদেশের ছুরি কাঁচি গেল, এইরূপে স্বদেশের সমস্ত গেল তবুও নিদ্রাভঙ্গ হইল না; ইহাতে গরিব হইব না ত কি হইব? আমরা কোনরূপ ব্যবসা শিক্ষা না করিয়া কেবল চাকরি চাকরি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, আমাদের অদৃষ্টে অষ্টরম্ভা বই আর কি হইবে?

ভাই বঙ্গবাসিগণ! ব্যবসা ভিন্ন কেবল চাকরি করিয়া কোথায় কে বড়মানুষ হইয়াছে দেখাইতে পার? আমেরিকা, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যে মেলা মাইরি ক্রোরপতি দেখা যায় সে কেবল ব্যবসায়ের নিমিত্ত।

এক বাণিজ্যের গুণে বম্বে নগরে জেমসেট্ জি কত টাকা রাখিয়া গিয়াছেন শুনিতে পাওনা কি? তাঁহার মূলধন ১৬টী পুরাতন পোর্টের বোতল মাত্র! কলিকাতার মতিলাল শীলের এক দিন বোতলের ব্যবসা ছিল, আর এখন সেই মতি শীলের সংসারে প্রতিদিন ২০০০৲ টাকা আয়। এই সকল ব্যাপার কি চাকরিতে হইয়াছে?

তোমরা কি চাকরি ভিন্ন জীবিকা নির্ব্বাহের অন্য কোন উপায় দেখিতে পাও না? গবর্ণমেন্ট তোমাদিগকে কত চাকরি দিবেন? এবং সওদাগরেরাই বা কত চাকরি দিবে? তোমরা প্রতি বৎসর প্রায় ৩। ৪ হাজার ভারতবাসী

লেখা পড়া শিখিয়া প্রস্তুত হইতেছ, গবর্ণমেন্ট কত পদ তোমাদের জন্য সৃষ্টি করিবেন? তোমরাও এ দিকে ধনুক-ভাঙ্গা পণ করিয়াছ যে চাকরি ভিন্ন অন্য কোনরূপ উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে না; স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ যে স্বর্গ ভোগ ইহা তোমাদের মনে কি এক দিনের জন্যও উদিত হইল না? তোমাদের পরনে বস্ত্র নাই, উদরে অন্ন নাই, ট্যাক্স খাজনার জ্বালায় অস্থির, তথাপি উপায় অন্বেষণ করিবে না; জীবিকা নির্ব্বাহের কোটি কোটি উপায় থাকিতে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবার প্রয়োজন কি? গোটাকতক বাঁধাবাঁধি টাকার নিমিত্ত মনিবের ঝাঁটা লাথি খাইবার দরকার কি?

চাকরি তোমাদের জীবনের এমনি মূল মন্ত্র হইয়াছে যে চাকরি চাকরি জপ না করিয়া তোমরা জলগ্রহণ কর না। কলিকাতায় শত শত মূর্খ মাড়োয়ারী, শত সহস্র ইহুদি, অসংখ্য সেটি, বহুতর পার্সি ও সহস্র সহস্র মূর্খ আরাকান এবং অন্যান্য অনেক জাতীয় লোক ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া একেবারে রাজা রাজড়ার ন্যায় পরম সুখে কালযাপন করিতেছে, তোমাদের নজরে কি ইহা পড়ে না? শত শত বঙ্গবাসীকে চাকর রাখিয়া ইহারা প্রতিপালন করিতেছে ইহাও কি দেখিতে পাও না?

পাবনা, কুমারখালি, ঢাকা মাইমানসিং প্রভৃতি পূর্ব্ব-বাঙ্গালার লোকেরা ব্যবসায় দ্বারা কত উন্নতি করিয়াছে; উহাদিগের মধ্যে যাহারা ব্যবসাদার তাহারাই বড় লোক।

তুমি ১৫ টাকার চাকরি পাইয়া দাসত্বরূপ আটাকাটিতে

বদ্ধ হইলে, এদিকে তোমার পিতা ছেলের চাকরি হয়েচে বলিয়া কখন সত্যনারায়ণের স্থণি মানিতেছেন, কখন বা রাধাবল্লভের নিকটে হরির লুট মানিতেছেন; তোমার স্ত্রী আনন্দে আটখানা হইলেন। কি সর্ব্বনেশে কথা—তোমরা ভাই গরিব হবে না, ত কি হবে?

তুমি যদি আলু পটল বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে তাহাতেও কি মাসে ১৫ টাকা হইত না? ছি ছি ভাই! তোমরা মুখে খুব টন্‌কো কাজে কিছুই নহে। তোমরা চাকরির জন্য যেরূপ লালায়িত, এর পর এণ্ট্রান্স পাস না করিয়া আর কুলিগিরিও করিতে পারিবে না।

মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ চাকরি না করিয়া কিরূপ সম্ভ্রান্ত হইয়াছিলেন ও কত টাকার অধিপতি হইয়াছিলেন? জগদ্বিখ্যাত কৃষ্ণদাস পাল, এম্ এ নন, বি এ নন, বিলাত যান নাই, পিতৃদত্ত অর্থও প্রাপ্ত হন নাই তথাপি কিসের বলে জগৎপূজ্য? বিদ্যাসাগর মহাশয় কিসের বলে ৭০০ টাকা বেতনের চাকরি তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিলেন? একমাত্র ব্যবসায়ের বলে। স্বাধীনতার গুণে আজি বিদ্যাসাগর যে দেবতার ন্যায় পূজ্য হইয়াছেন, সে দিকে এই দাসত্ব-ব্যবসায়ী জাতির মধ্যে কাহারো দৃষ্টি নাই—ছিছি বলিতেও লজ্জা হয়!

অষ্টম কাটি।

জমীদার পাঁচুবাবু—সাধুর জয়—অসাধুর পরাজয়।

বঙ্গের বক্ষে বসিয়া পাঁচুবাবু খুব জমীদারী করিলেন। কাছারীবাড়ী, গোলাবাড়ী, বাগানবাড়ী, প্রভৃতি বাড়ী-গুলি খুব বড় বড় বাড়ী। উজীর, নাজীর, পেস্কার, দাও-য়ানজী, পাঁচ সাতজন পাটোয়ার, ছড়িদার, মিদ্যে ও মোসাহেবে চারিদিক্ গস্ গস্ কচ্চে।

গোয়ালবাড়ীতে মেলা গরু। অমুকের একটি ভাল দুধলো গাই আছে এ কথা একবার শুনিতে পাইলেই বাবুর চাকর রামঘোষ রাত্রিকালে সেই গরু গোয়ালে আনিয়া তোলে এবং পৃষ্ঠে একটি প দাগিয়া দেয়। হরিবোল হরি! সেই দিন থেকে উক্ত গরুটা পাঁচুবাবুর হইয়া গেল; "আমার গরু" এ কথা বলিবার আর কাহারো সাধ্য থাকিল না।

দিনমানে পাঁচুবাবু কাছারিতে বসিয়া খুব ঘাঁক যমকের সহিত কাছারি করেন। আশামী, ফরিয়াদি ও সাক্ষী সক-লেরই প্রায় জরিমানা করিয়া ঘরে তোলেন। কেহ যদি টাকা দিতে না পারিয়া কান্নাকাটি করে, তা হলে দাও-য়ানজী বলেন, "যা বেটা যা, টাকা কটা এনে দে, এ যাত্রা খুব বেঁচে গেলি, আমাদের বাবুর মত সূক্ষ্ম বিচার কি

কেহ কত্তে পারে? হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিও বাবুর বুদ্ধির কাছে কলিকা পান না, তোর প্রতি খুব সূক্ষ্ম বিচার হয়েচে, যা টাকা এনে দে।”

প্রাতঃকাল হইতে প্রায় বেলা ১২ টা পর্য্যন্ত এইরূপে পাঁচ সাত টাকা বাক্সে পুরে, তবে বাবুজি তেল মাখিতে বসেন; তখন যেদোকল্লা বাঁশীরায় ও পিকেমিত্র প্রভৃতি জনকতক বদমাইস মোসাহেব কাছে এসে বসে ও কার বৌটী ভাল, কার ঝিটী সুন্দরী, এই সকল কথা পাড়িয়া লোকের সর্ব্বনাশের গোড়া পত্তন করিতে আরম্ভ করে।

বাবুর মোসাহেবদের মধ্যে সকল বেটাই এক একটী অবতার বিশেষ। ইহাদের মধ্যে কাহারো হৃদয়ে দয়ার লেশমাত্রও নাই; দিনমানে বাবুর কাছে থাকিয়া, কোন দিন বৈকালে গাড়ী চড়িয়া বাগানে যায়, কোন দিন বা সেতারের সঙ্গে ডুগি দেয়, কোন দিন বৈকালে জল-খাবার বলিয়া সরকারী যে এক খুঞ্চে জেলাপী আসে তাই কয় বেটায় কাড়াকাড়ি করে খাইতে আরম্ভ করে।

এই ত গেল দিনমানের কাজ; রজনীযোগে বেটারা আর এক রকম মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন বেটারা ছোঁ ছোঁ করে বেড়ায়; কার বৌ ঝি এনে বাবুর মন রক্ষা করিবে তাহারই যোগাড় দেখিতে থাকে।

পাঁচুবাবু স্নানের পর একটী গরদের জোড় পরিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া দালানে আহ্নিক করিতে বসেন; মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানেন না, কেবল বার কতক কোষাকুশী ফুল চন্দন নাড়া-চাড়া করিয়া শেষে এক চন্দনের টিপ কেটে উঠে পড়েন।

গিন্নী যে খড়মের শব্দ পান অমনি জলখাবারের রেকাবী খান হাতে করে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসেন, নতুন ঝি জলের গেলাস ও পানের ডিবে হাতে করে পেছনে পেছনে দৌড়ায়; বাবুর জলযোগ হইলে তৎক্ষণাৎ রাঁধুনী ঠাকরুণ ভাত এনে দাখিল করেন, গিন্নী অমনি পাখা হাতে করে কাছে বসেন, বাবু দুই একটী খোস গল্প করেন আর আহার করিতে থাকেন।

এইরূপ একদিন আহারে বসিয়াছেন এমন সময়ে গিন্নী বলিলেন, "শ্যামাসুন্দরের প্রসাদ এনে দেব খাবে?"

বাবু। ঝাঁটা মার, ঝাঁটা মার, মহাভারত সেই আতেলা ডাঁটা চচ্চড়ী, এড়া মোচার ঘন্ট ও চালতের অম্বল খেয়ে কি মরে যাব? তুমি এমন উপরোধ আর কখন করো না, প্রসাদ মাথায় থাকুক।

একদিন সন্ধ্যাকালে পিকেমিত্র বেটা সাঁৎ করে বরাবর বাবুর বৈঠকখানায় এসে একাকী বসিল। বাবু তাকে মাঝে মাঝে আহ্লাদ করে এঁড়ে পঞ্চানন বলে ডাকিতেন, তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, "কি পঞ্চানন যে—আজি এত সকাল কেন?"

পঞ্চা। আজ্ঞে শোনেন্ নি কি?

বাবু। ব্যাপার টা কি? কিছু নতুন আছে না কি?

পঞ্চা। আজ্ঞে আছে বৈ কি?

বাবু। কি আছে বল না?

পঞ্চা। দৈবজ্ঞদের সেই কাল মেয়েটা শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেচে। রূপ দেখলে আপনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন। ঠিক যেন মুক্তকেশী।

এই সকল কথার চালাচালি ক্রমে রামদৈবজ্ঞ শুনিতে পাইল।. রাম অত্যন্ত গরীব, সে প্রতিবাসী দুর্ল্লভ শান্ন্যালের কাছে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল এবং ঐ সকল কথা বলিয়া তাঁহার পায় ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। দুর্ল্লভ যেমন বলিষ্ঠ তেমনি তেজস্বী বীর পুরুষ; তিনি দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আচ্ছা তুমি সেই পাপাশয় দুরাচার বেটাকে আস্তে বলগে। তারপর যাহা কর্ত্তব্য আমি করিব এখনি।"

এই কথা শুনে রাম আপনার দরজার পাশে আসিয়া বসিল এবং কি করিবে ভাবিতে লাগিল, এমন সময়ে পিকেবেটা আস্তে আস্তে এসে বলিল, "আচার্য্য দাদা, বাবু যে আপনার বাড়ী দেখিতে ইচ্ছা করেন।"

আচার্য্য মহাশয় শান্ন্যাল মহাশয়ের উপদেশ মত বলিলেন, "আচ্ছা তাঁর যদি এ ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে না হয় সন্ধ্যার পর আস্তে বলিও—কিন্তু অধিক লোকজন যেন সঙ্গে' না থাকে, কারণ জলটল খাবার দিতে আমি কোথায় পাব।"

পঞ্চাবেটা এই কথা শুনিয়াই লাফিয়ে উঠিল ও দৌড়ে গিয়ে বাবুকে বলিল, "মহাশয়! কাজ ফতে করেছি—দৈবজ্ঞ বলেচে আজি বাবু যেন আমার বাড়ীতে বেড়াতে আসেন—সন্ধ্যার পর চলুন আর কি।"

বাবু। তার পর কি করিবে।

পঞ্চা। আজ্ঞে, বেটাকে আট্‌কে রেখে দেব এখনি। ভূতসিং পাহারায় থাকবে, তার জন্য আর ভাবনা কি?

আপনি সিংহ সে বেটা শেয়াল, আপনার সে কি করিতে পারিবে?

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। বাবুর মনটা খুঁতমুত করিলেও বাবু কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া, আতর গায় দিয়া, হারামজাদ্‌গি করিবার জন্য রামদেবজ্ঞের বাড়ীর মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পাঠক! বলিতে কি, বাবু যে গিয়া উপস্থিত হয়েচেন অমনি শান্যাল মহাশয় কোথা হতে আসিয়া বাঘে যেমন ছাগল ধরে সেইরূপে পাঁচুবাবুর ঝাঁকড়া চুল ধরিয়া পটাপট্ জুতা মারিতে আরম্ভ করিলেন; পঞ্চাবেটা বেগতিক দেখে টেনে দৌড় মারিল, বাবু তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া—"ওগো তোমাদের পায়ে পড়ি, ওগো তোমাদের গু খাই—আমাকে আর মেরো না, আমি এমন কুকর্ম্ম আর করিব না," বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন শান্যাল মহাশয় একটা কাটিতে বিষ্ঠা মাখাইয়া পাঁচুবাবুর মুখে কাটিটা পুরে দিয়ে বলিলেন, "যা বেটা প্রাণ নিয়ে চলে যা—এবার তোর প্রতি অনেক দয়া করিলাম," এই বলে ছাড়িয়া দিলেন।

পাঁচু বাবু পড়ে ত ওঠে না, একেবারে বাড়ীপানে পলায়ন। পাঠক! টাকা থাকিলে কি হয়, তেজ ও ধর্ম্ম না থাকিলে কেবল টাকায় কি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারে? পাঁচু বাবুর টাকা আছে কিন্তু তেজও নাই ধর্ম্মও নাই সুতরাং পাচু বাবু পশু অপেক্ষাও নীচ।

শান্যাল মহাশয়ের টাকা নাই কিন্তু তেজ ও ধর্ম্ম এই দুটী

অমূল্য রত্নই তাঁহার শরীরকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং কাহাকেও ভয় করেন না, তিনি দেবতা বলিয়া সকলের নিকটেই পূজনীয়। তিনি অত্যন্ত তেজের সহিত পাঁচু বাবুর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন, পাঁচু বাবু রাম গঙ্গা কিছুই বলিলেন না।

এইরূপে দুমাস ছয়মাস গেলে ক্রমে পাঁচু বাবু শান্যাল মহাশয়ের সঙ্গে একটু আধটু গা মাথামাথি করিলেন কিন্তু প্রতিশোধের চেষ্টা তাঁহার মনেই থাকিয়া গেল ; যাহা হউক সে দিকে শান্যাল মহাশয়ের দৃক্পাতও নাই।

নবম কাটি।

—০—

প্রতিশোধের চেষ্টা।

পাঁচু বাবুর জুতা খাওয়া ও বিষ্ঠা খাওয়ার কথা প্রায় সকলেরই কাণে গিয়াছে কিন্তু ফুটে বলে এমন লোক গ্রামের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

একদিন পাঁচু বাবু কাছারি করে উঠে গেলেন; পরাণে খানসামা তেল এনে দিল, তিনি মাখিতে বসিলেন, এমন সময় পিকে মিত্র বেটা ঝাঁৎ করে সেই খানে এসে ঢুকিল। বাবু পিকে বেটাকে দেখেই বলিলেন, কি পঞ্চানন ভায়া কি মনে করে?

পঞ্চা। আজ্ঞে মনে আবার কি, বেটাকে কিসে জব্দ করা যাবে তাই জপমালা হয়েচে।

বাবু। ভায়া গামাখামাখি করিলে কি হয়, বেটাকে যে দিন হাতে পাব সেই দিন সেরে ফেলবো।

পঞ্চা। আজ্ঞে তা হবে, ও বেটা কত দিন এড়াবে।

বাবু। আচ্ছা কোন একটা উপায় ঠাওরাও দেখি—বেটা বড় হারামজাদা।

পঞ্চা। আজ্ঞে উপায় ঢের আছে—কত্তে পাল্লেই হয়।

বাবু। যত টাকা লাগে খরচ করিব তুমি একটা উপায় দেখ দেখি? সে দিন রাত্রে বেটাকে মেরেছিলাম আর কি, কেবল একটা গোল মাল হবে বলে চলে এলাম।

পঞ্চা। আজ্ঞে তাই ত বটে, নিন্দে হতে আপনারই হইত; কারণ সাদা কাপড়েই বেশি কালীর দাগ লাগে। আপনি যে তখন একটা গোলমাল না করে সরে এসেচেন বেশ করেচেন।

বাবু। সে কথা যাক, এখন দুষ্ট বেটাকে পাড়িবার কি বল দেখি।

পঞ্চা। আজ্ঞে খুব সহজ উপায় আছে।

বাবু। কি?

পঞ্চা। আজ্ঞে স্মুখে মাঘ মাস আপনার বাড়ী রটন্তী পূজা হবে এবং সেই উপলক্ষে কবিও হবে। শান্ন্যাল বেটার ভয়ানক কবি শোনা বাই, বেটা নিশ্চয়ই আপনার বাড়ীতে কবি শুনতে আসবে; সেই সময়ে ফিকির করে উপরের বৈঠখানায় নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে পিটিয়ে ভূতোনন্দী করে ছেড়ে দেবেন।

বাবু। বেশ বলেছ, তাই করা যাবে।

ক্রমে মাঘ মাস আসিল। চারিদিকে রটন্তী পূজার ধূম ধাম লেগে গেল, বাবুর বাড়ীতেও পূজা, জাঁক যমকের সীমা নাই—বিদেশ থেকে ঢাকি, ঢুলি ও কবিআওলা পর্য্যন্ত যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৪ই মাঘ রটন্তী পূজা; রজনীর শেষভাগে বেলেডাঙ্গার ঢুলিরা আসরে নামিয়া তাকুতা কি শো বাজিয়ে দিল, বাবুর বাড়ীর চারি দিকের চক্ লোকে ভরিয়া গেল—কবি আরম্ভ হইল।

প্রাতঃকালে স্নান আহ্নিক সারিয়া শান্ন্যাল মহাশয় বৈদ্য-

রাম্ব কালী সেনের সহিত কবি শুনিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পঞ্চা বেটা তাকে তাকে ছিল। সে শান্ন্যাল মহাশয়কে যে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছে, অমনি ঝাঁৎ করে উপরে গিয়া বাবুকে সংবাদ দিল।

বাবু। বেশ হয়েছে; কোন কৌশলে এই খানে ডেকে আন, তবে ত কায়দা হবে?

পঞ্চা। আমি কি কিছু বলিতে পারি? বাবা! ও বেটা যে গোঁয়ার; আপনি দাওয়ানজীকে বলুন, তিনি কোন কিকিরে ডেকে আন্‌বেন এখনি।

বাবু। আচ্ছা, দাওয়ানজীকে তুমিই বল না কেন।

পঞ্চা। নানা প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া দাওয়ানজীকে সব কথা বলিল। দাওয়ানজী কি করেন, বাবুর মন রক্ষা করা চাই সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও একবার গিয়া বলিলেন, "শান্ন্যাল মহাশয়! চলুন না কেন উপরে যাওয়া যাক, সেখানে তামাক টামাক সব পাওয়া যাবে এখনি।"

শান্ন্যাল মহাশয় ধার্ম্মিক ও অত্যন্ত সাহসী বীর পুরুষ; পূর্ব্ব বৃত্তান্ত চকিতবৎ মনে হইলেও তিনি সে দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া বরাবর উপরে চলিয়া গেলেন।

পাঁচু বাবু ঘরের মধ্যে বসে তামাক টান্‌ছিলেন; শান্ন্যাল মহাশয়কে দেখিবা মাত্রই বলিলেন, "আসুন তামাক খান" এই কথা বলিয়াই তাঁহার হাতে হুকা দিলেন এবং কথায় কথায় বলিলেন, "আচ্ছা শান্ন্যাল, এখন ত তোমাকে হাতে পেয়েছি, এখন কি হবে?"

তেজস্বী শান্ন্যাল মহাশয় এই কথা যে শুনেচেন অমনি

তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "তুমি নিজে পারিবে, না লোকজন ডাকিতে হবে? তুমি ভাব যে লোকজন ডাকিবার জন্য হা করিতে না করিতে তোমার নন্নুড়িটে কাম্‌ড়ে ছিড়ে ফেলাব।" এই বলিয়া হাঁ করে বাবুর সম্মুখে গিয়া নন্নড়ি ছিঁড়িতে উদ্যত। তখন বাবু "হাঁ হাঁ করেন কি, আমি তামাসা করেছি," এই মাত্র বলে ওকথা উড়াইয়া দিলেন। শান্ন্যাল মহাশয়ও উপর থেকে নেমে এসে দরজার পাশে দাঁড়াইয়া কবি শুনিতে লাগিলেন। তখনও তাঁর মনে কোন ভয় কি আশঙ্কা নাই; তিনি পূর্ব্বের ন্যায় উদাসীনই রহিলেন।

পিকে মিত্র বেটা তফাত হইতে এই কাণ্ড দেখে টেনে দৌড় মারিল। দাওয়ানজী তখন বাবুকে বলিলেন, "বাবু শান্ন্যালের সঙ্গে ত একবার মিট্‌মাট্ হয়ে গিছিল, তারপর আবার বিবাদ কেন? আপনি উঁহাকে কোন রূপেই পারিবেন না, কারণ উনি যেমন তেজস্বী তেমনি ধার্ম্মিক, শরীরেও অসাধারণ শক্তি আছে; অতএব উঁহার সঙ্গে মিট্‌মাট্ করে চলাই ভাল।"

পাঁচু বাবু একে পাজির শিরোমণি, তাতে নিস্তেজ—মনের মধ্যে কিছু মাত্র বল নাই সুতরাং দাওয়ানজীর কথায় সম্মত হইয়া বেশ প্রতিশোধ তুলিলেন। পাপী কি কখন তেজ দেখাইতে পারে? কখনই না।

দশম কাটি।

কলির হরি সভা।

ইংলিস গবর্ণমেন্ট খুব পাপাপাকি হয়ে বদ্ধমূল হইল। বিলাত থেকে দেদার চিনের বাসন, ছুরী, কাঁচি, সাবান, দেশলাই ও মদ আসিয়া কলিকাতায় আমদানি হইতে লাগিল; স্কুলের ছোট ছোট ছোঁড়ারা পর্য্যন্ত একটু আধটু রম হুইস্কি খাইতে আরম্ভ করিল, যুবা ও বুড়োদের ত কথাই নাই।

এ মদ খায়, সে মদ খায়, ডাক্তার বাবুর বৌ পর্য্যন্ত মদ খান, এই কথা ক্রমে ক্রমে চারিদিকে ছড়িয়ে পলো। এই কাণ্ড কারখানা দেখিয়া, জনকতক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ মাতাল একত্র হইয়া এই পরামর্শ করিল, "দেখ ভাই বাইরে ত বড় নিন্দা হলো; এস আমরা একটা হরিসভা করি। প্রতি সোমবারে সন্ধ্যার পর সভার অধিবেশন হইবে। হরি সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবত পাঠ, ও ভাল ভাল বক্তৃতা প্রতি সভাতেই হইবে।" এই বলিয়া, সেই সোমবারেই সভার উদ্যোগ হইল; অদ্বিত গোঁসাই সেদিন কোনরূপে ভাবগত পাঠ করিয়া সভা রক্ষা করিলেন।

সভার সভ্যগণের মধ্যে অধিকাংশ সভ্যই প্রায় সভা ভঙ্গের পর তাড়াতাড়ি মদের দোকানে গমন করেন। সভার দিন কেহ নতুন মালা গলায় পরেন, কেহ বা সর্ব্বাঙ্গে তিলক ছাপা কাটিয়া আসেন এবং কেহ কেহ বা

বাউলের গীত বেঁধে এনে ডুগীর সঙ্গে গান আরম্ভ করেন, নতুন নতুন খুব ধূমধামের সহিত সভা চলিতে লাগিল।

সভার দিন একটু বেলা থাকিতে থাকিতে কাঁসারিদের ও তেলিদের আঁড়িগুলা এক একটা ফরাসি ছিটের ঝুলি হাতে ক'রে আগে ভাগে সভা দেখতে এসে বসে; কিন্তু কে কি মতলবে আসে, তাহা সেই জানে, আর দুই এক জন সভ্যই জানেন।

এক দিন প্রায় রাত্রি বারটার সময়ে সভা ভঙ্গ হইলে, মাতালের শিরোমণি চৈতন বাবু বলিলেন, "এত রাত্রি পর্য্যন্ত সভা হইলে চলে না; লোকজন যদি বিরক্ত হইয়া উঠিল তবে ভক্তি হবে কি রূপে?"

এই কথা শুনে যথার্থ হরিপরায়ণ গোপীচরণ দাস বাবাজি বলিলেন, "ইহা ত আর বাজে কাজ নয়, যে দেরি হইলে, কোন ক্ষতি হইবে; কলিতে হরিনামই যখন জীবের উদ্ধারের উপায়, তখন নাম করিতে একটু রাত্রি হইলে কি ক্ষতি হইবে?"

অমনি চৈতন বাবু বলিলেন, "বাবাজি, আপনারা বৈষ্ণব বৈরাগী লোক, বিশেষ প্রকৃত বৈষ্ণব, আপনাদের বৈষ্ণবীও নাই, কোন সংসারের জ্বালাও নাই, আপনারা দুই প্রহর রাত্রি কেন সমস্ত রাত্রি বসে এই কাজ করিতে পারেন; কিন্তু আমরা সেরূপ পারি কই? আমাদের ছেলে পিলে নিয়ে ঘর করিতে হয়, ভাত কোলে করে অত রাত্রি পর্য্যন্ত কে বসে থাকে; কাজেই এত রাত্রি হলে আমাদের পোষায় না।"

এই কথা শুনিয়া সভার সম্পাদক বীরেশ্বর বাবু বলিলেন, "চৈতন বাবু, আর ও কথা নিয়ে অত তোলা পাড়া কচ্চেন কেন? আগামি সোমবার বেলা তিনটার পরেই সভা আরম্ভ করা যাবে, সন্ধ্যার পরেই সব কার্য্য শেষ হইবে, তা হলেত আপনার আর কোন আপত্তি থাকিবে না?" চৈতন বাবু বলিলেন, "না, তাহলে আপত্তি কি?"

চৈতন বাবু এদিকে তামাক খান না, কিন্তু তাঁর ভুঁড়ে পেটটিকে একটী ব্রাণ্ডীর পিপে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিক রজনীতে মদের দোকান বন্ধ হয় বলিয়া, অত রাত্রি পর্য্যন্ত সভা থাকে ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে।

এই সকল সভ্য প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাড়ীতে গিয়া, "রাধামাধব যুগল উজ্জ্বল রস" বলিয়া খুব চেঁচিয়ে গান ধরেন, কিন্তু তাহাতেও কাহার কাহার মাতাল নাম ঘুচিয়া ধার্ম্মিক নাম প্রচার হইল না। এক দিন সন্ধ্যার পর চৈতন বাবু সভার সহকারী সম্পাদককে বলিলেন, "কৈ সভা করেত ভাই কিছুই হইল না; আমাদের মাতাল নাম না ঘুচিয়া বরং বেড়ে উঠিতেছে। মাতাল ত লোকে বলেই, তার উপর আবার ভক্ত বিটেল বলিয়া ঠাট্টা করে। তুমি ত ভাই নেটিব ডাক্তার, যেখানে যাবে সেই খানেই পয়সা, আমাদের যে চিরকালই এইখানে থাকিতে হইবে; অতএব আর সভায় কাজ নাই। আগামি সভাতে তুমিও এসোনা আমিও আসিব না, দুই চারি সভাতে এইরূপ কল্লেই সভা মভা কোথায় চলে যাবে।"

সহকারী সম্পাদক রাজু বাবু এই কথা শুনে বল্লেন, "তাইত, হরিসভায় আসিব, নাম সংকীর্ত্তন করিব, তিলক ছাপা কাটিব, মালা গলায় দেব, আরো লোকে মাতাল, ভক্তবিটেল বলিয়া ঠাট্টা করিবে। তাইত ভাই, এযে এক আঙুল সেলাই কত্তে গিয়ে আট আঙুল কাড়িয়া গেল। দূর হোক ছাই সভায় আর কাজ নাই। চৈতন বাবু, আপনি ঠিক বোলেচেন, সভায় না আসাই ভাল।

"আরো দেখুন এই সভা করে অবধি হিন্দু কটার বেশ সুবিধা হয়েচে। তাহাদিগকে পাঁচজনে সুখ্যাতিও করে এবং অনুরাগও করে, আমাদের অদৃষ্টে ছাই হলো। আজি থেকে ভাই হরির চরণে দণ্ডবৎ, কোন ভেড়ো আর সভাতে আসে।"

চৈতন বাবু। আমরা ভাই প্রাণান্তে মদ ছাড়িতে পারিব না। সভায় এসে কি হবে? যদি বল পরকালে ভাল হবে, তাহা কেউ দেখতে যাবে না।

সহকারী। আর এক মজার কথা শুনেচ কি?

চৈতন। কি?

সহকারী। সেদিন বৈকালে ঘোষেদের বাড়ীতে কথা শুনিতে গিয়াছিলাম। কথক বেটা বল্‌চে কি, 'যারা মদ খায় তারা রৌরবে গমন করিবে।" রৌরব কি জান?

চৈতন। হাঁ জানি বৈ কি। স্বর্গের শিঁড়ির নীচে যে চোর কুঠরীটা আছে, তাহারই নাম রৌরব, ইহাও কি এত দিন জানিতে না?

সহকারী। ব——টে; ভাই বলিতে হয়, তবে ত ভাই

আমাদের পক্ষে স্বর্গে উঠিবার অনেক সুবিধা। এখন থেকে যে বেটা আমাদের নিন্দা করিবে তাহাকে আচ্ছা করে দশ কথা শুনিয়ে দেব? সত্যই ত বটে, তা না হলে বলরাম মধুপান করিবেন কেন?

এইরূপ পরামর্শ করিয়া, রাজু বাবু ও চৈতন বাবু সভাটি ভাঙ্গিয়া দিলেন। সভার অন্যতম সভ্য ভজহরি সভার এই দুরবস্থা দেখিয়া মুখে খুব দুঃখ করিলেন কিন্তু মনে মনে তিনি বড়ই আনন্দিত হইলেন, কারণ ৫২ বৎসর বয়সে তিনি একটি অবিদ্যা রাখিয়াছেন, সভার দিন সন্ধ্যা হইতে প্রায় রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত তাঁর সেখানে যাওয়া কামাই হয় এই জন্য তিনি মনে মনে সভার উপর বড়ই বিরক্ত ছিলেন। এখন সভা ভাঙ্গিল দেখিয়া, ভজহরি মনে মনে বলিলেন "রাম বাঁচলাম; হরিসভায় দিন কতক বড়ই উৎপাত করে-ছিল।"

পাঠক! এমন যে পবিত্র হরিনাম তাহাকেও এই দুরাচারেরা মলিন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারা ভাবে যে ধর্ম্মের একটা মুকোস মুখে দিয়া কুকর্ম্ম হইতে এড়াইব ও সংসারে খুব একটা নাম কিনিব, কিন্তু হরিনাম যে ভক্তি ভিন্ন কাহাকেও স্থান দেন না, এই দুরাচারেরা তাহার অণুমাত্রও অবগত নহে।

একাদশ কাটি।

আম গাছে স্বর্ণ-লতা।

বাঙ্গালা দেশের রাজা বল্লাল সেন যেন বেদব্যাসের দাদা; কারণ বেদব্যাসের কথা যেমন অকাট্য, কেহ ঠেলিতে পারেন না, বল্লাল কৃত কৌলিন্য মর্য্যাদাও ঠিক সেইরূপ। নববিধ গুণ থাক আর নাই থাক, কুলীনের বেটা কুলীন হয়ে কি কারখানাই কচ্চে।

অমুক বিষ্ণুঠাকুরের বাচ্ছা একথা কিছু কাহার গায় লেখা নাই, তথাপি ড্যাব ড্যাবানির চোটে মেদিনী কাটিয়া যায়। তাই বলি যে, যাঁহারা বড় বড় কুলীন তাঁহারা যদি পিটে কি বুকে কিম্বা কপালে একটা পোড়ান ছাপের দাগ দিয়ে রাখেন, তাহলেও আগে ভাগে কুলীন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

এখনকার সময়ে যিনি যত বড় উচ্চ কুলীন তাঁর আশাও তেমনি উচ্চ। যিনি বিষ্ণুঠাকুরের ছেলে তিনি আজি কালি বিয়ে করিতে ২০০০ টাকাতেও সম্মত হন কি না সন্দেহ। যিনি বেগের গাঙ্গুলী তিনি বলেন, "যদি রূপার দান দিতে পার, তবে আমার গোপালের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহের কথা প্রস্তাব করিও, নচেৎ ও কথাতে কোন দরকার নাই।"

এইরূপে দেদার টাকা লইয়া ইহাদের মধ্যে কেহ দশ, কেহ ষোল, কেহ কেহ বা পঞ্চাশটী পর্য্যন্ত বিবাহ করিয়া থাকেন। বিবাহই ইঁহাদের ব্যবসায়। ধর্ম্ম পত্নীর সহিত

যে একত্র মিলিত থাকিয়া ধর্ম্মের সঙ্গে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, এ বিষয়ে এই মহাত্মাদিগের অতি অল্পমাত্রও আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না।

মন্ত্রপূত ধর্ম্মপত্নীকে ইঁহারা কামপত্নী মনে করিয়া, সেই সকল ভদ্রলোকের কন্যাগণের সহিত ইঁহারা পৈশাচ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত বা পরাবর্ত্তিত হন না; পয়সা পাইলেই ইঁহারা সব করিতে পারেন। উঃ—কি ভয়ানক ব্যাপার! কি শোণিত শোষক ব্যবসায়! নরকের কীটরূপী এই সকল দুরাচার কবে যে এই সকল পৈশাচ-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিবে বলিতে পারা যায় না।

ইহারা এক দিকে যেমন কিছু অর্থ পাইলেই পূর্ব্ব পত্নী ত্যাগ করিয়া নূতন কুমারীর পাণিগ্রহণ করে, অন্য দিকে তেমনি আপনাদিগের ভগিনী বা কন্যাদিগের বিবাহ না দিয়া, অনায়াসে চিরকাল থুবড়ি করিয়া রাখে। ইহাতে যে অত্যাহিত ঘটে তাহা অনায়াসেই এই দুরাত্মারা সহ্য করিয়া থাকে। ধন্য দেশাচার!!

এই বিবাহ ব্যবসায়ী দুরাচারেরা শ্বশুর বাড়ী থেকে পয়সা আদায় করিবার জন্য কিরূপ ভয়ানক পাপকার্য্যে লিপ্ত হয়, তাহার একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই স্থানে দিতে হইল। পাঠক আপনি পাঠ করিবার সময় একটু ধৈর্য্যশালী হইবেন, পড়িতে পড়িতে যেন কাঁদিয়া ফেলিবেন না।

নন্দনপুর নামক গ্রামে এক অতি দুঃখিনী বিধবার দুইটী কন্যা, বড়টীর নাম কামিনী ও ছোটটীর নাম শ্যামাসুন্দরী। ইহারা কুলীনের কন্যা, ইহাদিগের পিতা বর্ত্তমানে দুই জনে-

রই বিবাহ হয়; কিন্তু বিবাহের পর দুর্ভাগ্যবশতঃ কামিনীর অদৃষ্ট পুড়িল, কামিনী বিধবা হইয়া সংসারের সমস্ত সুখ হইতে বঞ্চিত হইল।

শ্যামার পতি আছে, সেটা বিষ্ণুর বাচ্চা, অতি গণ্ড মূর্খ; মাঝে মাঝে শ্বশুর বাড়ীতে আসে, আর সেই দুঃখিনী শাশুড়ীর কাটনা কাটা দুই চারিটী টাকা লইয়া যায়। দুরাত্মা শ্যামাকে কখন বাড়ীতে লইয়া যায় নাই এবং শ্যামার সঙ্গে কখন ভাল করিয়া আলাপও করে নাই। শ্যামার ন্যায় এই দুরাত্মার আরো দশ বারটী স্ত্রী আছে; যখন যেখানে সুবিধা পায়, তখন সেই খানে গিয়া দুই চারি টাকা আদায় করিয়া আসে।

পাঠক! এখানে আমি শ্যামার রূপ বর্ণন করিতে চাই না। এক কথায় বলিতেছি যে, শ্যামা এক জন সুন্দরী রমণীর মধ্যে গণনীয়। শ্যামার পিতা থাকিতে শ্যামাদের অবস্থা বড় মন্দ ছিল না, কিন্তু তাঁর মৃত্যু হওয়া পর্য্যন্ত শ্যামার মা কোন রূপে কন্যা দুটী লইয়া দিনপাত করিয়া থাকেন।

একদিন সন্ধ্যার পর ইহারা তিন মায়ে ঝিয়ে ঘরের দাওয়াতে বসিয়া গল্প করিতেছে, এমন সময়ে শ্যামা হঠাৎ বলিল, "মা তুমিত দিদির সঙ্গে খুব গল্প করিতেছ, ঘরে যে একটিও চাল নাই তা ভাবিতেছ না; হাঁ মা, কাল আমাদের কি করে চলিবে?"

কামিনী অমনি বলিল, "আ মর, তোর সে ভাবনায় কাজ কি? ওবেলাকার যে ভিজে ভাত আছে সেগুলি

তুই ত এখন খা, তার পর কালিকার কথা কাল হবে। বিধাতা যদি মাপান তবে কালি খাব, না মাপান উপোষ করে থাকিব; সেজন্য এখন ভেবে কি হবে। যা তুই খেতে বোস্‌গে।”

এই কথা শুনে শ্যামা আর কোন উত্তর না করিয়া প্রদীপটী হাতে করে ঘরে গিয়া ভাত খেতে বসিলেন। তাঁর অর্দ্ধেক আহার হইয়াছে এমন সময়ে তাঁর স্বামী কোথা হতে আসিয়া, দুয়ারে ঘা দিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

কামিনী গলার স্বর শুনিয়াই মাকে বলিল, “মা উমেশ এসেছে, হরিনামের মালা রেখে শীগ্‌গির গিয়া দুয়ার খুলে দাও,” এই কথা বলিয়া তিনি নিজেই তাড়াতাড়ি গিয়া দুয়ার খুলে দিলেন।

উমেশ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঘরের দাওয়াতে উঠিল এবং চারিদিক দেখিয়া বলিল, “একটা বসিবারও কি স্থান নাই?” কামিনী তাড়াতাড়ি একটি পাটী পাতিয়া দিল। জামাইবাবু বসিলে কামিনী বলিল, “উমেশ ভাল আছ ত?” উত্তর “হুঁ”। তার পর কামিনী তার মার কাণে কাণে কি বলিয়া, খিড়কী দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল এবং ময়রা দোকান থেকে কিছু জলখাবার ধার করিয়া আনিল।

জলখাবার আসিলে কামিনীর মা জামাইকে বলিলেন, “উমেশ, পথে কিছু খাওয়া দাওয়া হয় নি, বড় ক্ষুধা হয়েচে, উঠে জল খাও।”

এদিকে শ্যামা আনন্দে আটখানা হয়ে দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া অন্ধকারে এক একবার উঁকি দিয়া দেখিতেছেন। জামাই বাবু জল খেতে প্রথমে কত ওজর আপত্তি করিলেন কিন্তু কামিনীর খোসামোদে ও বিনয়ে সে সকল আপত্তি টেঁকিল না, সুতরাং লজ্জার খাতিরেই হউক, আর খোসামোদের জন্যই বা হউক, তাঁহাকে জল খাইতে হইল, কাজে কাজেই তাঁর প্রথম বাণ ফস্‌কিয়া গেল।

জামাইবাবু যখন জল খেতে বসিলেন, সেই অবকাশে কামিনী প্রতিবাসী ঘোষেদের বাড়ী গিয়া সমস্ত জানাইলে, ঘোষেদের বাড়ীর গিন্নী খুব আদরের সহিত চাল, ডাল, কিছু তরকারী একটু লবণ তৈল ও একটু ঘি আর খান কতক কোটা মাচ দিয়া বলিলেন, "যাও মা শীগ্গির গিয়ে রেঁধে বেড়ে জামাইকে আহার করাও গে, কাল সকাল বেলা আমরা গিয়ে দেখে আসিব।"

কামিনী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বাড়ী আইলেন ও পাক চড়াইয়া দিলেন; তাঁর মাতাও রান্নাঘরে গিয়া বসিলেন। এই অবসরে শ্যামা কত কি ভাবিয়া আস্তে আস্তে গুণ পুরুষের কাছে মাটীতে আসিয়া বসিলেন। কি বলিয়া যে আলাপ করিবেন তাহা ভাবিয়া তখনও স্থির করিতে পারেন নাই, কিন্তু তা বলে চুপ করে থাকিলেন না, অতি মৃদুস্বরে একবার বলিলেন, "অনেক দিন আস নাই, ভাল আল আছ ত?"

জামাই। আর খোসামোদ কত্তে হবে না। ও রকম খোসামোদ ঢের দেখেচি।

শ্যামা স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিবেন কি প্রথমেই মুখ ছোপ পাইয়া তাঁর চক্ষু দুটি ছল ছল করিতে লাগিল, ক্রমে দুই এক বিন্দু জলও আসিয়া দেখা দিল; কি করিবেন চক্ষের জল চক্ষে মারিয়া বলিলেন, "তুমি কি আমার উপর রাগ করিলে ?"

জামাই। তোর মা ও বুন ত তাড়াতাড়ি করে রান্নাঘরে গিয়া রান্না চড়িয়ে দিল, আমি খাব কি না তাত একবার জিজ্ঞাসাও করিল না।

শ্যামা। সে কি! পথশ্রান্ত হয়ে এসেছ, হয়ত সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি, আহার করিবে না কেন ?

জামাই। ঢাক ঢাক গুড়্ গুড়্ কি, দশটী টাকা না দিতে পারিলে শর্ম্মারাম কখনই খাবেন না। জল খেইটি সেই তোর বাপের ভাগ্যি। আমরা বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান তা জানিস্? আমরা যেখানে পা ধুই অন্য লোকে সেখানে মাথা পাত্তে পারে না।

এই কথা শুনে শ্যামার মুখে আর কথা নাই, তাঁর সমস্ত আশা ভরসা একেবারে উন্মুলিত হইয়া গেল। তিনি তখন আস্তে আস্তে উঠে রান্নাঘরে গিয়া, কামিনীকে বলিলেন, "দিদি একবার এই দিকে এস, একটা কথা বলিব।"

কামিনী শুনিবামাত্র উঠিয়া এলেন। শ্যামা আস্তে আস্তে ঐ সকল কথা তাঁর নিকটে বলিলেন। কামিনী ত শুনিবামাত্র একবারে যেন গাছ থেকে পড়িল এবং কি করিতে হবে স্থির করিতে না পারিয়া মার কাছে সব ভাঙ্গিয়া বলিল।

গৃহস্বামিনী বলিলেন, "কামিনি! আমার কাছে পাঁচটী কাটনা কাটা টাকা আছে; তার জন্যে আর ভাবনা কি? যদি তেমন তেমন হয় সেই পাঁচটী টাকা না হয় দেব এখনি।"

এই কথা শুনে কামিনীর হৃদয় দুঃখ ও সাহসে একেবারে আক্রান্ত হইল; তিনি সে কথার আর কোন আন্দোলন না করিয়া রন্ধন কার্য্য সমাপ্ত করিলেন এবং স্থান পরিষ্কার করিয়া, জামাইকে বলিলেন, "উমেশ রান্না হয়েচে, আহার করিতে এস।"

জামাই। আমি খাব না।

কামিনী। কেন?

জামাই। কুলীনেরা মর্য্যাদা না পাইলে কোনখানে আহার করে না, ইহা কি তুমি জান না?

কামিনী। মর্য্যাদা ভঙ্গ হবে না।

জামাই। ক টাকা সংগ্রহ করেছ?

কামিনী। যত টাকাই হউক, আমাদের অবস্থা দেখিলে তাতে তুমি অসন্তুষ্ট হবে না।

জামাই। আগে এই খানে রাখ তার পর ও কথা বলিও।

এই কথা শুনে কামিনী তাঁর মার গা টিপিলেন, গৃহস্বামিনী তখনি পাঁচটী টাকা এনে দিলেন।

কামিনী টাকাকটী জামাইবাবুর কাছে রাখিলে, দুরাত্মা আড়চক্ষে একবার দেখিল এবং কি ভাবিয়া টাকাকটি তুলিয়া ট্যাঁকে গুঁজিল ও উঠিয়া আহার করিতে গেল।

ভোজনান্তে জামাই বাবু ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন।

কামিনী শ্যামাকে একখানি বাসি ধোপ কাপড় পরাইয়া, দুরাচারের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্যামা ঘরে প্রবেশ করিয়াই আস্তে অস্তে নিষ্ঠুরের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন; দুরাশয় তাঁর দিকে তাকাইয়া বলিল, "আর টাকা কৈ? আরো ৫৲ টাকা যদি আনিতে পারিস, তবে বিছানায় বসিতে পাবি, নচেৎ চলে যা।"

কি সর্ব্বনাশ! কামিনী গাঁটা দিয়ে এই সকল কথা শুনিয়া তাঁর মাকে গিয়া বলিলেন। তাঁর মা আর কি করিবেন, কামিনীর কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শ্যামা বালিকা নহে, কিশোরীও নহে, নবযুবতীও নহে, সে মধ্যযুবতী; জ্ঞানের যথেষ্ট উদ্রেক হইয়াছে। এত অপমানেও তিনি স্বামীর নিকটে অপমান বোধ করিলেন না। পদতলে বসিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। চক্ষু লাল হইল এবং সেই চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া অশ্রুবিন্দু মাটিতে পড়িতে লাগিল।

পাঠক! আপনি মনে করিতেছেন যে, এইবার হয়ত শ্যামাসুন্দরীর দুঃখে দূর হইব, কিন্তু তাহা মনেও ভাবিবেন না; কারণ অসুরের হৃদয়ে দয়া কোথায়? শ্যামার এত কষ্টেও দুরাত্মার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল না।

শ্যামা পাপাত্মার পদতলে মৃত্তিকার উপর বসিয়াছেন। বাম হাঁটুর উপর দক্ষিণ হাঁটু, বামহস্ত তলে পৃথিবী চাপা এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জনী দিয়া ঘরের মেজের মাটী খুঁড়িতেছেন, আর নীরবে কাঁদিতেছেন।

এর মধ্যে জামাইবাবু আর একবার বলিলেন, "ঘুমুতে

দিবিনে নাকি ? ভাল উৎপাত জুটেচে। হয় টাকা নিয়ে আয়—না হয় সোজা পথ আছে দুয়ার খুলে চলে যা, অমন করে ফোস্ কোঁস্ করে কেঁদে আর মায়া বাড়াতে হবে না। মেয়ে মানুষ গুলো যেরূপ শয়তান তা আমার বেশ জানা আছে। যা উঠে যা, ফের যদি অমন করে কাঁদবি তবে লাথি মেরে ফেলে দেব।”

শ্যামা এই সকল নিষ্ঠুর বাক্য শুনিয়া রামগঙ্গা কিছুই বলিলেন না ; কিন্তু তাঁর চক্ষু ফেটে জল বাহির হতে লাগিল, স্বভাব আর নীরবে তাঁহাকে কাঁদিতে দিল না। তাঁহার রোদনের সঙ্গে যখন অল্প অল্প শব্দ ও নিশ্বাস প্রশ্বাস শুনা যাইতে লাগিল, তখন এই নরাধম পিশাচ ধড়মড় করে উঠিয়া, শ্যামার দক্ষিণ বাহুমূলের কাছে সজোরে একটি লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিল এবং বলিল, “রাত্রি প্রভাত হলে বাঁচি, তোর মার টাকা নেই তা আমার কি ? তোর মতন আমার দশ বারটা স্ত্রী আছে তা জানিস্ ? যা এখান থেকে উঠে যা।”

এই কথা শুনিয়া শ্যামা চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁর কান্নাটান্না একেবারে সব ভাল হইয়া গেল ; কি ভাবিলেন তা তিনিই জানেন। এদিকে আর কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া কামিনী রান্না ঘরে গিয়া মার সঙ্গে একত্র শয়ন করিলেন।

শ্যামা শয্যার অনতিদূরে ঘাড়টী হেঁট করিয়া চুপ করে বসিয়া থাকিলেন। এদিকে নরপিশাচ ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল, ঘড়ঘড় করে নাক ডাকিতে লাগিল। পাঠক ! এইবার

বড় ভয়ানক দৃশ্য! আপনি যেন কাঁদিয়া ফেলিবেন না। শ্যামাসুন্দরীদের পাচ দুয়ারের কাছে যে আমগাছ আছে এইবার তাহার ডালে একগাছি অতি ক্ষীণ স্বর্ণলতা ঝুলিতেছে দেখিতে পাইবেন।

সকলে নীরব হইয়াছে, রজনীও প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত, চারিদিক্ চমচম্ করিতেছে এমন সময়ে শ্যামা আস্তে আস্তে উঠিলেন এবং গলায় অঞ্চল দিয়া স্বামীর পায়ের নিকটে একটী প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দাসীর কোন অপরাধ লইবেন না, আপনার দাসী জন্মের মত বিদায় লইল।" তার পর আস্তে আস্তে খিল খুলিয়া, তিনি বাহিরে আইলেন, পাতকূয়ার কাছে গিয়া দড়াগাছি লইলেন এবং খিড়কীর বাহিরে যে আমগাছ আছে তাহার ডালে দড়াগাছি বাঁধিয়া, পৃথিবীর সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লইলেন; আমগাছে স্বর্ণলতা ঝুলিতে লাগিল।

রজনী প্রভাত হইলে এই ব্যাপার প্রচার হইয়া পড়িল, বাড়ীর মধ্যে রোদনের ধ্বনি উঠিয়া সকলকেই আকুল করিয়া তুলিল, শ্যামার স্বামী দুরাত্মা এই কাণ্ড দেখিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল। তার পর গৃহস্বামিনীর ও কামিনীর যে অবস্থা ঘটিয়াছিল তাহা আর এখানে বর্ণনীয় নহে, বলিবারও তত প্রয়োজন নাই।

পাঠক মহাশয়! আপনারা এই চিত্রটী বেশ করিয়া দেখুন এবং ইহাতেও যদি কৌলীন্য মর্য্যাদার প্রতি ভক্তি করিতে ইচ্ছা করেন, করুন। আপনারা জনকতক শিক্ষিত

কুলীনের ছেলে, যদি চিরকাল কন্যাকে কুমারী না রাখিয়া বংশজের ঘরে কন্যার বিবাহ দেন, তা হলেই সব ল্যাঠা-ফট্‌কা চুকিয়া যায়।

আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি আশ্চর্য্য-গুণাবলী যাহার শরীরে থাকিবে, তিনি বংশজই হউন আর যাহাই হউন, তাঁহার মর্য্যাদা ত কখনই কমিবে না, তবে কেন কৌলীন্য-মর্য্যাদা লইয়া দেশের এত অনিষ্ট করিতেছেন?

সমান ঘরের অভাবে যে সকল কুলীন-কন্যার বিবাহ হয় না—অর্থাৎ মর্য্যাদাভঙ্গ ভয়ে তোমরা যে সকল ভগিনীর বিবাহ দিতে পার না, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রায় পিতৃকুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, তোমাদের মুখে চিরকালের জন্য চূণকালী মাখাইয়া রাখেন, আর যাঁহারা নিতান্ত লজ্জার খাতিরে বাহির হইয়া যান না, তাঁহারা ঘরে বসিয়া ভ্রূণহত্যা করিতে থাকেন, সেই পাপ আবার তোমাদিগকে ঢাকিয়া রাখিতে হয়। ছি! লেখাপড়া শিখিয়া ও সভ্যতার সোপানে পদার্পণ করিয়াও তোমাদের এত কুরুচি? তোমরা শীঘ্র এই প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, পাপের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ কর।

পাঠক! আর একটি কথায় মনোযোগ দেন—মনুর মতে হয় ত, ঐ কন্যারাই দোষী; তিনি এতদিন বেঁচে থাকিলে, হয় ত, ঐ কন্যাদিগের হাত, পা কি নাক কাটার একটা ব্যবস্থা করিয়া বসিতেন। যাহাই হউক, যাহারা কৃত্রিম কুলমর্য্যাদা-ভঙ্গ ভয়ে আপনাদের কন্যাগণকে চিরকাল কুমারী করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে, মনুর মতে হউক

না হউক, আমার মতে উত্তপ্ত লৌহশলাকা লইয়া ঐ দুরাত্মাদিগের চক্ষে প্রবেশ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

দ্বাদশ কাটি।

কলিতে ছেলেদের বিয়ে।

অতি প্রাচীনকালে যখন দেশের মধ্যে সভ্যতা প্রবেশ করে, তখন মহাত্মা মনু দেশের লোককে শাসনে রাখিবার জন্য নানাপ্রকার আইন কানুন প্রস্তুত করিলেন। তিনি আইন করিয়া এরূপে চারিদিক্ আঁটিয়া দিলেন যে কাহারও সাধ্য নাই যে, সে আইন লঙ্ঘন করিয়া এক পা চলিতে পারেন।

মনুর আইন বড় শক্ত আইন। শূদ্রান্ন ব্রাহ্মণে গ্রহণ করিলে, ব্রাহ্মণের অসিপত্র নরকে গমন করিতে হইবে। যিনি অন্যের বনিতা অপহরণ করিবেন, যমদূতেরা তাঁহাকে তপ্তশূর্ম্মী আলিঙ্গন করাইবে। যিনি কন্যাবিক্রয় করিয়া

পয়সা উপার্জ্জন করিবেন, তাঁহাকে চিরকাল কালসূত্র নরকে বাস করিতে হইবে। এইরূপ ও অন্যরূপ নানাপ্রকার বিধি ব্যবস্থা করিয়া, দেশের মধ্যে খুব নাম সম্ভ্রম কিনিলেন, কিন্তু ছেলে বেচিয়া পয়সা উপার্জ্জনের কোন শাসনই করিলেন না।

কলিতে লোকে ছেলের বিবাহ দিবার সময়ে যে রূপার দান, সোণার ঘড়ীচেন, ও প্রচুর টাকা চাহিয়া বসিবে বোধ করি ইহা তখন মনুর মনে উদিত হয় নাই; তাই তিনি পুত্রবিক্রেতাদিগের প্রতি কোনরূপ কঠিন দণ্ডবিধানের কথা লিখিয়া যান নাই। যদি তিনি ইহা ঠুক্কারে বুঝিতে পারিতেন যে, কলির দেবতারা ছেলের বিয়ে দিবার সময়ে অতি পাষণ্ডের ন্যায় নির্দ্দয় হইয়া, কন্যাকর্ত্তার সর্ব্বস্বান্ত করিবেন, তাহা হইলে হয় ত এর জন্যেও কোন একটা নরকের সৃষ্টি করিতেন; কিন্তু ভ্রমক্রমে তাহা করেন নাই বলিয়া, কলির দেবতারা ছেলের বিবাহ দিবার সময়ে কন্যাকর্ত্তার গলায় পা দিয়া জিহ্বা পর্য্যন্ত টানিয়া বাহির করিতেছেন।

কলিকাতার কায়স্থ ও সুবর্ণ-বণিক্‌দিগের মধ্যে এই প্রথা সর্ব্বাগ্রে প্রচলিত হয়। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার নিকটে যে টাকার দাওয়া করিতেন, আজি কালি প্রায় তাহার চল্লিশ গুণ পণ বৃদ্ধি হইয়াছে।

কন্যা যতই সুন্দরী হউক না কেন, টাকা দিতে না পারিলে কোন রূপেই তাহার বিবাহ হইবার যো নাই। যাঁহার দুইটী কন্যা অথচ মাসে ১০০ টাকা বেতনের চাকরি করেন, তিনিও কন্যার বিবাহের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া একেবারে জীর্ণ শীর্ণ

কলেবর; কারণ, ১০০ টাকা বেতন হইতে তিনি কতই বাঁচাইতে পারিবেন। ঐ টাকার মধ্যে সংসার খরচ, ডাক্তার-খরচ, লোক লোকতা সমস্তই করিতে হইবে সুতরাং কোন মাসে ৫ টাকা বাঁচে, কোন মাসে বা উল্টা ৫ টাকা গায় বাধিয়া যায়; কাজেই তিনি মেয়ের বিবাহের জন্য ভেবে ভেবে চাম বাদুড় হইয়া পড়েন।

এদিকে ছেলের বাপের পাথরে পাঁচ কীল; ছেলে ইংরাজী পড়িতেছে, ছেলের দর দুই হাজার টাকার ন্যূন নহে। ছেলে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়াছে অমনি আর দুহাজার টাকা দর বাড়িয়া গেল। ছেলে এল, এ, পাশ করিয়াছে, আর রক্ষা নাই, তখন ছেলের বাপ এঁটে কসে বসিয়া গেলেন। আর ছেলে যদি দৈবাৎ বি, এ পাশ করিল তখন ছেলের বাবা লম্ফ দিয়া তাল ঠুকিতে আরম্ভ করিলেন; কখন বলেন রূপার দান, বাঁউড়ী স্যুটের পাকা সোণার গহনা, মুক্তার মালা, ঘড়ীচেন আর নগদ ২০০০ টাকার কাগজ দিলে তবে দেখা যাবে। কখন বলেন রূপার দান ত সকলেই দিয়া থাকে, দুটা সোণার বাটী ও সরপোষ আওলা একটা সোণার গেলাস না দিলে আমার সুরেশের বিবাহ দেব না—কখনই দেব না, কাহারও অনুরোধ শুনিব না, যদি স্বয়ং গুরুদেব আসিয়া উপরোধ করেন তাহাও শুনিতে পারিব না।

পাঠক। ইহাত গেল বরকর্ত্তার বাহিরের কথা, এই মহাত্মা কালনেমি অন্দরে গিয়া স্ত্রীর সহিত যেরূপ গল্প করেন সেগুলি একবার শ্রবন করুন।

কালনেমি। বলি তুমি যে প্রত্যহ বাড়ী বাড়ী করে ভেক্ত কর, আর তাহা করিতে হবে না।

গিন্নী। কেন, কি হয়েচে, বাড়ীর কোন যোগাড় হয়েচে নাকি? এক রাত্রির মধ্যে আমাদের ভাগ্য ফিরিল নাকি?

কালনেমি। বাড়ীর যোগাড় কি, তোমার সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারের পর্য্যন্ত যোগাড় হয়েচে।

গিন্নী। এর মধ্যে এত সৌভাগ্য কিসে বাড়িল, ভেঙ্গেই বল না কেন?

কালনেমি। কেন জান না কি সুরেশ যে এবার বি এ পাশ করেচে।

গিন্নী। বি এ পাশ করেচে তাহাতে আমার গহনা এখন কেমন করে হবে? তবে চাকরি টাকরি হলেও বা একথা একদিন বলিতে পারিতে। কোন খানে কিছু নেই একেবারে বাড়ী গহনা কিরূপে হবে, খেপেছ নাকি?

কালনেমি। তুমি মেয়ে মানুষ অতশত বোঝ না, সুরেশের যে বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, নগদে জিনিসে দশটী হাজার টাকা নিয়ে তবে বিবাহ দেব।

গিন্নী। তা তুমি দিও—বলি মেয়েটী কেমন?

কালনেমি। যেমন হোক না কেন, রুধির নিয়ে কথা, টাকা পেলেই হোল।

গিন্নী। টাকার লোভে একটা কাণা কি কুঁজো মেয়ে আনিবে নাকি?

কালনেমি। কাণা কুঁজো হবে কেন? হাত পা থাকিলেই হোল।

গিন্নী। তাই বোলে কি একটা কালো আঁধার বুড়ি আনিবে না কি?

কালনেমি। কেন কাল হলে দোষ কি? তুমি যে কাল, তোমার কি শ্রীছাঁদ নেই, না গড়ন পিটন ভাল নয়? লোকে যে তোমাকে শ্যামা মার মতন সুন্দরী বলিয়া সুখ্যাতি করে।

এই কথা শুনে সুরেশের মা একটু মুখ টিপে হেঁসে বল্লেন, "মরণ আর কি, ভাল করে কথা কহিতেও কি জান না?

আমি আবার কথা কহিতে জানিনে, কত সভা মেবে এলাম, সেদিন আলিপুরের মাঠে যে বক্তৃতা ঝেড়েছিলাম, লোকজন সব শুনে অবাক্ হয়ে গিচিল।

গিন্নী "বল্লেন, সে যাহা হোক আমি মেয়ে মানুষ তোমার বক্তৃতা টক্তৃতা অত বুঝি না; বিয়ে দিয়ে যেন একটী ভাল মেয়ে আনা হয়। এখনকার ছেলে পিলে কেমন তাত খবর রাখ না, মেয়েটী যেন সুন্দরী হয়, তাতে যদি দুটাকা দশটাকা কম পাও সেও ভাল।"

পাঠক! এই বিবাহরূপ সংক্রামক রোগ প্রথমে কলিকাতায় দেখা দেয়, তার পর এখন প্রায় সকল স্থানেই ছড়িয়ে পড়েচে। যার কুল নাই, কিছুমাত্র বংশমর্য্যাদা নাই, এমন কি জাতি পর্য্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না, তিনিও এখন ছেলের বিয়ে দেবার সময়ে ঘড়ী চেন, ঝুড়ি পাঁচছর গহনা ও নগদ টাকা চাহিয়া বসেন।

এই রোগ প্রথমে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বড় একটা প্রভুত্ব

করিতে পারে নাই। কিন্তু আজি কালি ব্রাহ্মণের মধ্যেও ইহার ক্ষমতা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

যাঁহার দুটী ছেলে তিনি বিয়ের সময়ে মেলা টাকা পাইবেন এই আশা করিয়া বসিয়া থাকেন কিন্তু বিধাতার কলম কে খণ্ডাইতে পারে, এর মধ্যে যদি তাঁর তিন চারিটী কন্যা হয়, তা হলেইত দফা রফা; তখন যে কাঠায় মাপ সেই কাঠায় যে বাড়ী শুদ্ধ শোধ দিতে হয়, পরস্পর এইটী ভাবিলেই ত সব আপদ মিটে যায়; কাহাকেও দায়গ্রস্ত হইয়া আর মেয়ে পার কত্তে হয় না।

কলিকাতায় বৌবাজারের মলঙ্গায় একজন সোণার বেণের পিট্‌ পিট্‌ পাঁচটী মেয়ে হইয়াছিল বলিয়া বাড়ীর মধ্যে মরা কান্না পড়িয়াছিল; কেন? কাঁদিবার প্রয়োজন টা কি?

ছেলে কি মেয়ে ভিন্ন মানুষের পেটে গোরু বাছুরও হয় না, গাছ পালাও হয় না; হয় মেয়ে না হয় ছেলে হয়, তবে মেয়ে হোলে এত ভাবনা চিন্তা কেন? সর্ব্বনাশীর বিয়ের সময়ে পিতা মাতা সর্ব্বস্বান্ত হবেন ভাবিয়া মরা কান্না পড়ে।

এখন কান্নাকাটি দিয়া যাইতেছে, এর পর হয় ত, রাজপুতানার ন্যায় মেয়ে মারা প্রথা এদেশে প্রচলিত হইয়া দাঁড়াইবে।

ইহার পর দেশের মধ্যে যত সভ্যতার বৃদ্ধি হইবে সেই সঙ্গে সঙ্গে বিবাহেরও দর খুব বাড়িয়া যাইবে, এত বাড়িয়া যাইবে যে হয়ত, বাড়ী ঘর বেচিয়াও কেহ কেহ

মেয়ের বিবাহের টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, কাজেই মেয়ের প্রাণ দণ্ড না করিলে আর অব্যাহতি পাইবেন কি রূপে? সুতরাং মেয়ে মারা রীতি যে শীঘ্রই এ দেশে আপনার প্রভুত্ব প্রকাশ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ত্রয়োদশ কাটি।

মানুষ-বাঘ।

আমরা ছেলেবেলায় দিদিমার কাছে গল্প শুনেছি যে জটে রামকেষ্টা নামে এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রের চোটে মানুষ হতে বাঘ হয়েছিল। দিদিমা একদিন এই কথা বলিলে, আমি বলিলাম, "দিদি মা, জটে রামকেষ্টা কেমন করে বাঘ হয়েছিল দিদি মা?" তখন দিদি মা বল্লেন, "শুন্‌বি কেমন করে বাঘ হয়েছিল, এই শোন্।"

রামকেষ্টা বামুনের ছেলে, তার মাথায় একটা খুব লম্বা জট ছিল, তাই লোকে জটে রামকেষ্টা বলে ডাকৃত।

জটে একবার কি কাজের জন্যে কামরূপে গিয়াছিল। সেখানকার লোক বড় গুণী, কত মন্ত্র তন্ত্র জানে; তাই রামকেষ্টা মেলা মন্ত্র তন্ত্র শিখে এসেছিল। রামকেষ্টা মন্ত্রের চোটে পাখী হতে পারিত, গাছ চালাতে পারিত, হ্যাদে বাঘ হতেও পারিত।

সে কামরূপ থেকে বাড়ী এলে, একদিন তার বৌ বলিল, "তুমি এতদিন কামরূপে থেকে কি করে এলে? কৈ টাকা কড়িও দেখ্‌লাম না, কিছুই দেখলাম না; এখন প্রাণে প্রাণে যে ফিরে এসেচ সেই আমার টাকা।

সেখানকার লোক যে গুণী, ভাগ্যি তারা তোমারে ভ্যাড়া কি পাঁটা করে রাখেনি তাই সর্ব্ব রক্ষে।”

রামকেষ্টা অমনি খুব বড়াই করে বলিল, “হাবি, আমারে কি ভ্যাড়া ম্যাড়া করিবার যো আছে? আমি বাঘ হতে পারি, পাখী হতে পারি, হ্যাদে গাছে চড়ে গাছ পর্য্যন্ত চালাতে পারি।”

রামকেষ্টা যে এই কথা বলেচে অমনি তার সেই আহ্লাদে পুতুলের মত ঠোঁট পুরু বৌটা বলে বসিল, “তবে তোমায় বাঘ হতে হবে, আমি বাঘ দেখ্‌বো— আমি কখন বাঘ দেখিনি।”

রামকেষ্টা একটু হেসে বলিল, “আরে পাগলি, সেকি মজা মস্কারাম; এখানে কি আমি বাঘ হতে পারি? আমি যদি বাঘ হই, আর তুই যদি ভয়েতে আঁউ মাউ করে আমার গায় জল পড়া দিতে না পারিস্ তখন কি হবে?”

বৌটা আমোদে আটখানা হয়ে বলিল, “তা আমি পারিব—নিশ্চয়ই পারিব। তুমি ত আর মানুষ খেগো বাঘ হবে না; মানুষও কিছু খাবে না; তা জল পড়া দিতে আর ভয় কি?”

জটে। পার্বি ত? দেখিস্ যদি আমাকে দেখে ভয় পাস্ তা হলে কিন্তু বড় বিপদ।

বৌ। না, তা কোন বিপদ্ হবে না। তুমি বাঘ হও, আমাকে যা বলিবে তাই করিব।

জটে আপনার স্ত্রীর অনুরোধ কোন মতে এড়াতে

না পেরে বলিল, "আচ্ছা আমি এই দুঘটি জল পোড়ে রাখিলাম, এর মধ্যে এই ছোট ঘটীর জল আমার মাথায় ঢেলে দিলে, আমি বাঘ হব; আর খানিক পরে এই বড় ঘটীর জল আবার আমার গায় মাথায় ঢা লয়া দিলে আমি যেমন মানুষ তেমনি হব। "দেখিস্ খুব সাবধান যেন কোন গোল মাল করে ফেলিস্‌নে, খুব হুঁসিয়ারিতে থাক্‌বি।" এই বোলে রামকেষ্টা রোয়াকের নীচে গিয়া আস্নপিঁড়ি হয়ে বসিল; বলিল, "দে জল ঢেলে দে"। এই কথা বলিবামাত্র তার বৌ সেই পড়া জল তার মাথায় ঢেলে দিল; আর কোথা যাবি, রামকেষ্টা মানুষ ছিল, একেবারে প্রকাণ্ড এক ডোরাদার বাঘ হয়ে আঁ আঁ করে সকল উঠানে চেঁচিয়ে বেড়াতে লাগিল।

এই ব্যাপার দেখে তার বৌ "ও বাবা খেয়ে ফেল্লে গো" বলে যেমন ঘরের মধ্যে পালাইবে, অমনি তার পা ঠেকিয়া সেই পড়া জলটুকু মাটিতে পড়িয়া গেল। রামকেষ্টা অমনি ক্যাল্ ক্যাল্ করে চারি দিকে তাকাইতে লাগিল।

তখন আর কোন উপায় নাই দেখিয়া, সেদিন কতক্ষণ এদিক্ ওদিক্ করে ঘুরে বেড়াল তারপর হতাশ হয়ে, বনে চলে গেল। ক্রমে ছাগলটা মানুষটা ধরে খেতে আরম্ভ করিল; কিন্তু রামকেষ্টা প্রতিদিন সন্ধ্যা কালে মানুষ হবার আশ্বাসে বাড়ীতে আসিত ও ঢেঁকিতে পাড় দিয়া জানান দিত। তার বৌ একদিন সন্ধ্যাকালে ঘর থেকে বেরিয়ে বলিল, "কেগা পৌষ মাসের দিন সন্ধ্যা কালে ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছ?" এই বলিয়া প্রদীপ হাতে

করিয়া বেরিয়ে দেখে যে, সেই বাঘটা এসে ঢেঁকিতে পাড় দিচ্চে। তখন "বাবা গো, সেই বাঘটা" বলে দৌড়ে গিয়া ঘরে খিল দিল। রামকেষ্টা সেইদিন যে হতাশ্বাস হয়ে চলে গেল, আর ফিরে এলো না কিন্তু মাগীর হাতে চিরকালই কড় ও দু গাছা রূপার পঁইছা রহিয়া গেল। মাগী তার পর বিশ বৎসর বাঁচিয়া ছিল কিন্তু কখন একাদশীও করিল না, কখন মাচ খাওয়াও ছাড়িল না, চিরকালই সধবা থাকিল।

পাঠক! মানুষে যে বাঘ হতে পারে ভটে রামকেষ্টার বিবরণ পাঠ করিয়া আপনি তাহার বেশ প্রমাণ পাইলেন। কিন্তু ইহা জানিবেন যে, পুরুষ মানুষে যেমন বাঘ হয় মেয়ে মানুষ তেমনি বাঘিনী হয়। এইখানে গোটাকতক মেয়ে বাঘিনীর কথা বলিব, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন।

বঙ্গীয় গৃহস্থেরা যখন স্ত্রী পুরুষে মিলিত হইয়া সংসাররূপ নন্দন কাননে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা পরম সুখে কালাতিপাত করিতে থাকেন। অতুল আনন্দ ও বিবিধ প্রকারের খেয়াল আসিয়া তাঁহাদের চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে। তার পর যখন তাঁহাদের সন্তান সন্ততি হইতে সুরু হয় তখন আরো আনন্দ—আরো সুখ; এমন কি সুখের কথা এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না।

তার পর ঐ সন্তান সন্ততির অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণ প্রভৃতি সংস্কারের সময়ে যার যেমন অবস্থা তিনি সেইরূপে আত্মীয় স্বজন লইয়া কতই আনন্দ করিতে থাকেন; ফলতঃ যাঁহারা গৃহী তাঁহাদের পক্ষে এই সকল আনন্দই স্বর্গীয় সুখ।

ওইরূপে ছেলের লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দিন গত হইলে, তাহার বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া দুই এক জন ঘটক আসিতে আরম্ভ করে। তাহাতে কর্ত্তাটীর মত হউক বা না হউক, গিন্নীটী শীঘ্র করিয়া পুত্রবধূর মুখ দেখিবেন বলিয়া, একেবারে আনন্দে মাতিয়া উঠেন এবং এ বিয়ে দিতেই হবে বলিয়া কর্ত্তাকে এরূপে চাপিয়া ধরেন যে, তিনি আর কোনরূপেই এড়াইতে পারেন না। একেবারে গৃহিনীর অনুরোধ আটাকাটিতে আবদ্ধ হইয়া পড়েন, তখন ধার করেই হউক আর পৈতৃক ব্রহ্মত্র জমী বেচেই হউক, পুত্রের বিবাহ দিয়া বৌমাকে ঘরে আনিয়া তোলেন।

যখন ছেলে বিয়ে করে বাড়ী আসে, তখন একদিকে ঢুলি বাদ্যকরেরা খুব রগড় দিয়া ঢোল বাজাতে আরম্ভ করে, অন্য দিকে গিন্নী স্বয়ং বালুচরে বুটোদার সাড়ী পরে ও কাণে নলঝুমকা ঝুলিয়ে কুলো ডালা নিয়ে বর কনেকে বরণ করিতে থাকেন। এদিকে শঙ্খের ধ্বনি ওদিকে পাড়ার পাঁচ সুন্দরীর হুলুহুলা শব্দ, আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না।

তার পর দুই তিন বৎসর কাল বৌমা খুব আদরে আদরে কাল যাপন করেন। রন্ধন করিতে হয় না, বাসন মাজিতে হয় না, এমন কি শাশুড়ী ঠাকরুণ স্বয়ং কোলে করিয়া কোন কোন দিন গঙ্গাস্নানে নিয়ে যান ও বৈকাল বেলা স্বহস্তে চিরণী ধরিয়া বৌমার চুল বাঁধিয়া দেন।

এই ভাবে কিছুদিন গেলে বৌমা যখন কৈশোর কাল হইতে যৌবন কালে গিয়া পদার্পণ করেন ভালরূপে চোক কাণ ফুটিয়া আসে এবং স্বামীর সহিত ভাল করিয়া আলাপ

করিতে শিখেন, তখন ঠাকুরাণীর আর সে ভাব বা সে আদর কিছুই থাকে না। তিনি তখন একেবারে মানুষ থেকে বাঘিনী হইয়া বসেন। সুশীলা নামক আপনার কন্যার সহিত মিলিত হইয়া বৌমার গাঁটে গাঁটে, হাড়ে হাড়ে দোষ দেখিতে আরম্ভ করেন।

কোন দিন বা সুশীলার সঙ্গে একত্র মিলিত হইয়া গিন্নী ছেলের ঘরে গাঁটা দিয়ে বলেন, "সুশীলা ঐ শোন্, একেবারে রাক্ষসী লজ্জার মাথা খেয়ে আমার বিপিনের সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কচ্চে। উঃ কি ছোট লোকের মেয়েই এনেচি; আহা ছেলেটাকে রাত জাগিয়ে জাগিয়ে একেবারে যেন সল্‌তে করে ফেল্লো।" প্রায় প্রত্যহ এইরূপে নিন্দা করিতে থাকেন, আর দিন রাত ছল ধরিয়া বৌটাকে গালি দিতে আরম্ভ করেন।

বিপিনের মা মানুষ থেকে বাঘিনী হয়েই সুশীলাকে এমনি করে তৈয়ার করে তুল্লেন যে, সুশীলা এক মাসের মধ্যেই একটী ডম্বুরণী হইয়া দাঁড়াইল।

বৌমা পাকশালায় গিয়া ডাল রাঁধিয়া রেখেছেন সুশীলা ঝাঁৎকরে তাতে খানিক লবণ ফেলে দিল; কোন দিন বা অজ্ঞাতসারে বৌমার কাপড়খানি খানিক ছিঁড়িয়া, দৌড়ে মার কাছে গিয়া বলিল, "মা তোমার বৌ সেই গড়যেন নতুন কাপড় খানায় মস্ত একটা ফালা দিয়েচে।"

গিন্নী অমনি বল্লেন, "ও বড় মানুষের মেয়ে, ছিঁড়িবে না কেন? বাবা ধন্যি মেয়ে, তবু এখন কারু চাকরি হয় নি; চাকরি হলে না জানি কতই হবে?"

এই সকল আকাশ ফোঁড়া কথা শুনে বৌমা কাঁদ কাঁদ হয়ে শাশুড়ীর অগোচরে সুশীলাকে বলিলেন, "ঠাকুর ঝি! আমি ত কাপড় ছিঁড়িনি, তুমি ঠাকরুণের কাছে বলে আমাকে কেন কতকগুলা তিরস্কার খাওয়ালে?"

সুশীলা অমনি বলিল, "ওমা কি মিথ্যাবাদী, কাপড় ছিঁড়ে বলে ছিঁড়িনি; যা হোক বাবা মেয়ে।" বৌমা গতিক মন্দ দেখিয়া বলিলেন, "ঠাকুর ঝি, আমি তোমার পায় হাত দিয়ে দিব্বি করিতে পারি, কোন চোক্‌খাগী কাপড় ছিঁড়েচে। আমি যদি কাপড় ছিঁড়ে থাকি তা হলে শীগ্‌গির করে যেন দুটী চক্ষের মাথা খাই।"

আর কোথায় যাবি, সুশীলা এই কথা যে শুনেছে সেই একেবারে চেঁচিয়ে উঠে মার কাছে গিয়া বলিল, "মা সেই কাপড় ছেঁড়া নিয়ে তোমার শান্ত বৌ একেবারে আকুণ্ডু কুণ্ডু করে তুলেচে; আমাকে না বলিল এমন কথা নেই। চোক্ কাটলো, ছরৎ কাট্‌লো আরও যা ইচ্ছে তাই বলিল। মাগো আমি আর এখানে থাকিতে চাইনে, আমি বিধবা হইচি বলে আমার কি কেহ নেই; কেন খুড়-শ্বশুর ত আছেন, আমি কালি শ্বশুর বাড়ী যাব, তুমি মা তোমার লক্ষী বৌ নিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘর কর। এখনো শ্বশুর বাড়ী গেলে খুড়-শ্বশুর ঠাকুর আমাকে কত আদর করে রাখেন।"

এই কথা শুনে গিন্নী বাঘিনী তখন বৌকেত যা বলিবার তা বলিলেন, তার পর রজনীযোগে কর্ত্তার কাছে ঐ কথার গায় আরো পাঁচখানি অলঙ্কার দিয়ে বেশ করিয়া লাগাইতে আরম্ভ করিলেন।

কর্ত্তা তামাক্ টানিতে টানিতে বলিলেন, "তুমিও যেমন পাগল, সামান্য একটা কথা নিয়ে কি অত গোল করিলে চলে; গোলযোগ যত বাড়াবে, ততই বাড়িবে। আচ্ছা কাপড় গিয়েছে গিয়েছে, আমি না হয় আর একখানা কাপড় এনে দেব।"

গিন্নী এই কথায় মুখখানা বিষপানা করে বল্লেন, "তা দেবে না কেন? আমি যে এই উলিডুলি নেকড়া পরে থাকি তবুত এক দিনের জন্যে একথা মুখ দিয়ে বেরোয় না।" এই বলিয়া ভালবাসার সাগরে একটু তুফান তুলে দিয়ে গিন্নী সেই বিষমুখে হন্ হন্ করে আর একটা ঘরপানে চলিয়া গেলেন; কিন্তু কর্ত্তা সে তুফানে বড় ভয় করিলেন না তিনি বেশ করে হালখানি এঁটে ধরে পেছগলিতে বসিয়া থাকিলেন।

দোষ করিলে গিন্নী সুশীলাকেও বকেন বৌমাকেও বকেন কিন্তু বকুনির বিস্তর তারতম্য আছে। যে মুখে বিড়াল বাচ্চা কামড়াইয়া ধরে সেই মুখে অবার ইন্দুরও ধরে কিন্তু ইঁদুরের মর্ম্ম চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভেদ হইয়া যায় বাচ্চা কামড় খাইয়াও মুদ্রিত নয়নে ঘুমাইতে থাকে!

সংসারের কাজ কর্ম্ম করিয়া বৌমার বড় পিপাসা হইয়াছে, তাই বেলা একটার সময়ে ভাঁড়ার ঘরে গিয়া নাগরি থেকে একটু গুড় নিয়ে, জল খাইতেছেন; এই ব্যাপার দেখিতে পাইয়া, সুশীলা তাড়াতাড়ি মার কাছে গিয়া বলিল, "মা তুমি বল নাগরির গুড় কি হোলো, আজি একবার ভাঁড়ার ঘরে গিয়া দেখ তোমার লক্ষ্মী বৌ সেই আভাঙ্গা নাগরি খানা ভেঙ্গে হাবলে হাবলে

গুড় খাচ্চে, বাবা ধন্য পেট! আমরা হলে অমন পেটে নুড়ো জ্বেলে দেই।”

গিন্নী অমনি বাঘিনীর মত দৌড়ে গিয়া বল্লেন, “ওমা কি রাক্কসীই এনেছি, তিন তিন খান নাগরি তার এক-খানাও কি চোকে দেখতে পেলাম না? ধনি্য মেয়ে বাবা। বলে,—‘বেস্তর দেখেচি চুরি কর্ত্তে এমন দেখিনি ধুকড়ি ভর্ত্তে’।”

বৌমার যত বয়স্ হচ্চে তত কিসে অপদস্থ হবেন, কিসে প্রত্যহ দশটা বকুনি খাবেন, তার জন্যে এই মানুষ-বাঘিনী ডম্বুরণীর সহিত সর্ব্বদা ছল দেখিয়া বেড়াইতেছে, বৌমা একাকিনী আর কি করেন, চুপ করিয়া বকুনি সহ্য করেন আর কখন কখন নির্জ্জনে গিয়া খুব খানিক কাঁদিয়া, মনের দুঃখ নিবারণ করেন।

বাড়ীর মধ্যে যে যত দোষ করুক না কেন, সব কানুর নামে ভণিতা — সুশীলা গোরু দিয়া চাল ডাল খাইয়েছে দোষ বৌমার; গোরুতে গিন্নীর কাপড় চিবিয়ে খাচ্চে ঝাঁটা খাবেন বৌমা। বৌমা যদি কোন দিন ঝি দ্বারা এক পয়সার কিছু এনে খাবেন, বাঘিনী অমনি বলিবে, “বাবা, এমন নোলা ত কখনও দেখিনি, আমরা ধনি্য বৌ এসেছিলাম, কখন সোণার সামগ্রীর দিকে তাকাই নি। আমরা যে পিশেশ খুড়শেশ নিয়ে কাটিয়েচি তোমরা হলে, মা এক দিনও কাটাতে পাত্তে না।”

একদিন বিপিন খেতে বসেচে সুশীলা পরিবেশন কচ্চে, প্রায় ভোজন শেষ হইবার সময়ে গিন্নী এঁটোহাতে

সেই খানে একবার এসে বল্লেন, "হ্যাঁরে বিপিন, আর কিছু নিবিনে? আর একটু ডাল এনে দেব?" বিপিন বলিল, "মা তুমি কি আজি রান্না ঘরে ছিলে? আমি খেতে বসে ভাব্‌লাম, বলি মা কোথায় গেলেন।"

গিন্নী অবকাশ পাইয়া অমনি বলিলেন, "আসিবার কি যো আছে বাপু, যে দিকে না তাকাব সেই দিকে ডুবে যাবে। বৌটী ছেলে মানুষ, সুশীলা ত ঐ আল্‌সে কুড়ে, আমি না দেখিলে কেমন করে চলে বল দেখি? পাছে বৌমার কষ্ট হয় সেই জন্যে যেদিকে জল পড়ে সেই দিকে ছাতি ধত্তে হয়।

"এই যে বৌটীকে সকাল সকাল নাওয়ালাম, জল-খাবার দিলাম, হ্যাদে ভাত বেড়ে দিয়ে এলাম, আমি না থাকিলে কে দিত বল দেখি?" বিপিন মার মুখে এই সকল কথা শুনে মাথা হেঁট করে থাকিল ও তাড়া-তাড়ি জল খেয়ে উঠিয়া গেল।

আর একদিন বৈকালে গিন্নী খুব উঁচু গলায় বল্লেন,—এ ঘরটা এখনও পরিষ্কার করা হয়নি কেন?" সুশীলা অমনি বলিল, "কেন বৌকে এত করে বল্লাম তবুও বৌ শুনিল না, বৌ বলিল "আমার দায় পড়েচে" কাজেই ঘর পড়ে রয়েচে।

এই কথা শুনিয়াই মানুষ-বাঘিনী বৌমার কাছে তাড়াতাড়ি গিয়া বলিল, "বলি হ্যালা তুই নাকি সুশীলার কাছে বলেচিস 'ঘর মুক্ত করিবার জন্যে আমায় দায় পড়েচে'?"

বৌমা। সেকি ঠাকরুণ! আমি ত তা বলিনি, আমি

বল্লাম, "গোয়ালে সাঁজাল দিয়ে তার পর গিয়ে ঘর মুক্ত করিব এখনি।"

গিন্নী। বাবা! চোপা দেখ, ইচ্ছে করে যে মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে মুখখানা কুটে দেই।

বৌমা অমনি নিঃশব্দ। যেন চোরের মত এক দিকে দাঁড়ায়ে নখ খুঁটিতে লাগিলেন। এই ছুতো পেয়ে মায়ে ঝিয়ে বেশ আড়ে হাতে লেগে গেলেন।

পূর্ব্বে বঙ্গের ঘরে ঘরে এইরূপ কাণ্ড কারখানা ছিল যে, সকল বধূ শাশুড়ীর গঞ্জনায় ও হিংসায় প্রাণে মরে থাকিতেন; তাঁহারা আবার শাশুড়ী হয়ে, মানুষ-বাঘিনী হয়ে দাঁড়াইতেন। শিক্ষার অভাবে এই প্রথা বরাবর চলিয়া আসিতেছিল।

যেখানে শিক্ষার অভাব সেইখানেই এইরূপ বিড়ম্বনা; যিনি এখন বধূ আছেন তিনি যেদিন শাশুড়ীর পদে উঠিবেন সেইদিন থেকেই মানুষ-বাঘিনী হয়ে দাঁড়াবেন। যিনি কুমারী, বাপের বড় আদরের মেয়ে, তিনি আবার অন্যের ঘরে বধূরূপে প্রবেশ করিয়াই দিনকতক খুব তিরস্কার খাবেন, তারপর যে শাশুড়ীর পদে অভিষিক্ত হইবেন, অমনি তিনিও একজন বাঘিনী হয়ে বসিবেন।

শিক্ষার অভাবে বৌতে -শাশুড়ীতে মিল হওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার। তবে যে কদাচিৎ শিক্ষার অভাবেও কোন কোন পরিবারে বৌতে শাশুড়ীতে মিল দেখিতে পাওয়া যায় সে কেবল সত্বগুণের কার্য্য; যে সকল স্ত্রী সত্ত্বগুণে গুণবতী তাহারা কখনই বিবাদ বিসম্বাদ ভাল বাসে

না, এই নিমিত্ত নববধূগণ ইঁহাদের নিকটে পরমসুখে কাল-যাপন করিতে পারেন ; আর বৌমাও যদি সেই সঙ্গে সত্বগুণা-বলম্বিনী হইলেন, তা হলে আর কথা কি ? সোণায় সোহাগা হইল ; কিন্তু এরূপ সংসারের ভাগ অতি অল্প।

আজি কালি বঙ্গীয় মহিলাগণ যথেষ্ট লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছেন এজন্য আমরা খুব প্রত্যাশা করি যে, এখনকার এই সকল বঙ্গমহিলা কখনই বাঘিনীর বেশ ধারণ করিবেন না, তাহা হইলেই তাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া, তাঁহাদের বধূ-গণও কখন বাঘিনী হইবেন না।

বর্ত্তমান কালের বঙ্গমহিলারা জ্ঞানবলে ও বিদ্যাবলে দেবীর স্বরূপ হইয়াছেন ও হইতেছেন, সুতরাং ইঁহাদের দ্বারা আমরা সংসারের প্রচুর মঙ্গল প্রার্থনা করি।

চতুর্দ্দশ কাটি।

—— •:• ——

কলির বামুন।

সেকালে বামুনের মুখে আগুন জ্বলিত, এমন কি হোম করিবার সময়ে কতকগুলা ভিজে কাষ্ঠ সাজাইয়া যে ফুঁ দিতেন আর দপ্ করিয়া জ্বলে উঠিত। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ যতি, কেহ বা আহিতাগ্নি ও কেহ কেহ বা মৌনব্রত-ধারী ছিলেন। তাঁহারা ত্রিকালীন স্নান ও সন্ধ্যা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না।

সেকালের বিপ্র-নন্দনেরা অতি শৈশব কালেই শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ বেদের এই ছয় অঙ্গ উত্তমরূপ অভ্যাস করিয়া শেষে বেদাধ্যয়ন করিতেন; কিন্তু এখন আর সেরূপ নাই, এখন ইংরাজী পড়িতে পারিলেই বেদ পড়া হইল।

এখনকার ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর আর পূর্ব্বের মত তেজ নাই, তথাপি ঠাট খানা আছে; ইহাঁদের মধ্যে যাহারা নিতান্ত পাথুরে বোকা, তাঁহারা গলার যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিয়া শিং ভেঙ্গে দামড়া হয়ে বেড়াচ্চেন। আর যাঁহারা খ্রীষ্টান হইয়া মজা লুটিতেছেন তাঁহাদের ত কথাই নাই।

যাঁহারা পৈতা ফেলিয়া দেন নাই অথচ রাম পাখীর ঝোল ও আতাউল্লা চাচার হাতে মুরগির ডালনা ভক্ষণ করেন এবং সমাজে গিয়া ধোপ পৈতার গোছা বাহির করে খুব ধূমধাম করেন, তাঁহারাই কলির ব্রাহ্মণ।

ইহারা বাহিরে বলেন, আমরা কি যে সে লোক, আমরা কেহ বল্লবী, কেহ সর্ব্বানন্দী, অশূদ্র প্রতিগ্রাহী, আমরা আছি বলে এখনো কলি চলিতেছে, তা না হলে এত দিন কলি মলি উল্‌টে কোথায় চলে যেত।

ইহারা শূদ্রের ছোঁয়া কোন দ্রব্য খান না, কিন্তু রজনী-যোগে পোদ্দার বাড়ী থেকে শ্যামা পূজার বৈকালি এলেও ছাড়েন না, তখন এই কথা বলিয়া ঘরে তোলেন, "আচ্ছা এনেছ রেখে যাও, আমার বাড়ীতে রাজমিস্ত্রী লেগেছে তারা কাল খাবে এবং চাকর বাকরেও কিছু কিছু ভাগ করে নেবে।"

মতে ময়রায় লবণ দেওয়া আলুর দম সর্ব্বাগ্রে এই কলির বামুনের ভোগেই লাগিয়া যায়। মতের মা দিন-মানে ছোলার ডাল রাঁধে, দুপুর বেলা ঐ ডাল দিয়া গোষ্ঠী বর্গে ভাত খায় কিন্তু খাবার সময়ে ঐ ডালের ছ্যাকড়া গুলা নিংড়িয়া রাখিয়া দেয়, মতে বেটা সেই ছ্যাকড়া গুলা চট্‌কিয়া কচুরির মধ্যে পুরে রজনীতে কচুরি ভাজিতে আরম্ভ করে, আর সেই গরম গরম কচুরি গুলা কলির ব্রাহ্মণের ভোগে লাগিয়া যায়।

একবার একজন কলির বামুন মাঘমাসে বর্দ্ধমান জেলা থেকে খাজনা আনিতেছিলেন পথে বড়-বেলুন গ্রামের নিকট একখান মদের দোকান দেখিয়া সেই খানে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

মদ্য বিক্রেতা মুচি বেটা বলিল—"কি ঠাকুর হবে না কি?"

ব্রাহ্মণ। হবে বলেই ত এসেছি।

মুচি। কত টুকু দেব?

ব্রাহ্মণ। তোর মদ নতুন চালের কি পুরোণো চালের তা আগে বল, তবে হবে।

মুচি। কেন ঠাকুর, তাতে আর আপনার ক্ষতি বৃদ্ধি কি হবে?

ব্রাহ্মণ। আরে বেটা আমার এখনো নবান্ন করা হয় নি কাজেই নতুন চালের মাল খাওয়া হবে না।

সেই খানে আর এক জন কলির বামুন মদ খেতে এসেছিল, সে এই কথা শুনে হাহা করে হেঁসে বলিল, "উঃ—কি বামনালি!! বাবা তোমার বাড়ী কোথায়?

আগন্তুক ব্রাহ্মণ মন্দ গতিক দেখে, তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পিটটান দিলেন, মুচি বেটা হাহা করে হাসিতে লাগিল।

পূর্ব্বে কলিকাতায় উইলসেনের বাটীতে যে সকল ভাল ভাল ইংরাজে খানা খাইত, হোটেলের চাকর বাকর তাঁহা-দের পত্রাবশিষ্ট এক জায়গায় করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিত, কুকুর শেয়ালে সেই গুলা খাইয়া উদর পূর্ত্তি করিত। আজি কালি আর তাহা ফেলে দিতে হয় না, শেয়াল কুকুরের সে সৌভাগ্য একেবারে পুড়ে গিয়াছে এখন হোটেলের পাছ দুয়ারে গিয়া কলির বামুনেরা সেই সকল প্রসাদ অল্প মূল্যে কিনিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ইঁহারা সেই সকল পত্রাবশিষ্ট প্রসাদ ক্রয় করিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী আসেন এবং আসিবার সময়ে রাধা-বাজার হইতে কিছু মালও কিনিয়া আনেন, তার পর ঘরে এসে পরমানন্দের সহিত সেই সকল হাড় গোড়

চুষিয়া স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতে থাকেন, কাজেই হোটেল-কর্ত্তারা এখন আর সে সকল পাত-কুড়ান প্রসাদ ফেলিয়া দেন না, আট আনা করিয়া তাহারই এক এক পাতড়া বিক্রয় করেন।

পলতাভাজা, নিম সুক্তানি, মানকচুর ঝাল ও ডাল চচ্চড়ী এখন আর ভাল লাগে না, এখন এঁড়ে গোরুর ডালনা, ষাঁড় চচ্চড়ী ও অক্সেনটং প্রভৃতি ইংলিস খাদ্য উপাদেয় খাদ্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে; তাই কলির বামুনেরা এখন সুক্তানি মুক্তানি ছেড়ে দিয়ে সাহেবদিগের ঐ সকল উপাদেয় খাদ্য খাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব কলির বামুনের খুরে দণ্ডবৎ! এঁরাই আবার দিনমানে ফোটা কেটে ঘোরতর বামনালি ফলিয়ে বেড়ান। ধন্য কালের মহিমা! এই সকল বামুনের পাদক-জলে কুড়ি মহাব্যাধি ও ধবল পর্য্যন্ত ভাল হইয়া যায়; কলিতে ইঁহারাই ধন্য!!

আর এক বার একজন কলির বামুন ভবানীপুরে এক মদের দেকানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, এক বেটা ধাঙড় একটা মেটে গেলাসে করে মদ খেয়ে চলে গেল। তার পর আর একজন মেতর এসে উপস্থিত হইল, সেও ঐ গেলাসে করে মদ খাইল, তার পর মেতর বেটা চলে গেলে যখন গোলমাল থামিল, তখন ঐ কলির বামুন বলিলেন, "আমাকে দু আনার মাল দাও হে।"

দোকানদার সেই গেলাসে করে মদিরা দিল। ব্রাহ্মণ খুব তাকে তাকে ছিলেন, তিনি ঐ গেলাসটার যে ধারে পূর্ব্বকার দুজন মাতালে মুখ দেয় নাই সেই ধারে মুখ দিয়া

চুমুক দিলেন এবং খানিক পরে বলিলেন, "যে কাল পড়েচে বাবা, তাহাতে জাতি রক্ষা করাই দায়; ভাগ্যি আমি দেখেছিলাম, তাই গেলাসের যে ধারে উহারা মুখ দিয়াছিল সে ধারে আমি মুখ দেই নাই, তাই কোন রূপে আজি জাতি বাঁচিয়ে বাড়ী চলিলাম।"

পাঠক! ইঁহারাই যথার্থ কলির ব্রাহ্মণ। ইঁহারা না থাকিলে এত দিন সংসার ডুবিয়া কোথায় চলিয়া যাইত। অতএব এই সকল ব্রাহ্মণদিগের চরণে হাজার হাজার দণ্ডবৎ।

পঞ্চদশ কাটি।

হায় কি হইল!

পূর্ব্বে আমাদের কেমন সুখের অবস্থা ছিল, এখন এ কি হইল? আগে কখন অনাবৃষ্টি নিবন্ধন দুর্ভিক্ষের কথা শুনা যাইত না, এখন প্রতি বৎসরেই প্রায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা। এ কি দুর্দ্দশা হইল? কার পাপে প্রজাসমূহের এত কষ্ট হইতেছে? এ প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে রাজার স্কন্ধেই পড়িয়া যায়, অর্থাৎ রাজার পাপেই প্রজার এত কষ্ট হইতেছে।

আগে এক টাকায় ভাল চাউল ১॥ মণ পাওয়া যাইত। এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে চাষ বাস হইতেছে, অথচ প্রধান খাদ্য যে ধান্য তাহার আকাশ কোঁড়া দর, শুনিলেই প্রাণ চমকিয়া উঠে। শুনিতে পাওয়া যায় যে নবাব শায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮ মণ চাউল হইয়াছিল; এখন ইংলিস গবর্ণমেন্টের আমলে একথা স্বপ্নবৎ বলিয়া প্রতীত হয়।

পাশ্চাত্য সভ্যতা পবিত্র ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া অবধি, আমাদিগের সন্তান সন্ততিরা পবিত্র সংস্কৃত ভাষা পরিত্যাগ করিয়া যেমন ইংরাজী শিক্ষা করিতেছে, তেমনি সেই সঙ্গে বিজ্ঞানেরও বিস্তর উন্নতি হইয়াছে ইহা সত্য বটে; কিন্তু অভাবরূপ পিশাচ যে ভারতের সর্ব্বত্র অনায়াসে পরি-

ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে সে দিকে ত কেহই দৃষ্টিপাত করিতেছে না। কেবল কাটা পোষাক, পেন্টুলান, পমেটম, হেয়ার ব্রস, বিলাতি মদিরা এই দিকেই লোকের দৃষ্টি। হায় হায়! এ কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল?

শ্যামবাবু মাসে ১৫০০ টাকা বেতন পান, কি রমেশবাবু মাসিক ৪০০০ টাকা ভৃতি ভোগ করেন ইহা দেখিয়া ভুলিলে চলিবে না। কারণ ২৫ কোটি ভারত সন্তানের মধ্যে যদি সহস্র লোকে মাসে ২০০০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হয়, তা হলে সাধারণতঃ দেশের যে কোন উন্নতিই হয় নাই ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

এক দিকে কোন এক পরিবারের লোক চাকরির টাকার বলে প্রত্যহ পায়স পিষ্টকাদি উপাদেয় খাদ্য ভোজন করিয়া উদ্‌গার তুলিতেছে; অন্য দিকে হাজার হাজার গৃহস্থ অন্নকষ্টে সপরিবারে হাহাকার করিতেছে। এক দিকে কএক জন চাকুরে লোক ভাল ভাল পোষাক পরিয়া অহঙ্কারে পথ দেখিতে পাইতেছেন না; অন্য দিকে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পরিবার অতি মলিন ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া কোন রূপে লজ্জা নিবারণ করিতেছে। এক দিকে জনকতক জমীদার প্রজার বক্ষঃস্থলে হাঁটু দিয়া তাহাদের জিহ্বা আকর্ষণ পূর্ব্বক রক্ত শোষণ করিতেছে, অন্যদিকে কৃষক-পত্নীরা সেই অনিবার্য্য উৎপাতে উৎপীড়িত হইয়া, হাহাকার পূর্ব্বক রোদন করিতেছে; এক দিকে জনকতক সেকেলে পণ্ডিত "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" বলিয়া চীৎকার করিতেছে, অন্যদিকে কোটি কোটি লোক নাস্তিক হইয়া, নরকের কীটরূপে

বিচরণ করিতেছে। এক দিকে চা-কর সাহেবেরা সতীর সতীত্ব হরণ করিয়া আপনাদিগের পাশব বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতেছে, অন্য দিকে দুর্ব্বল বঙ্গবাসিগণ "দোহাই ঈশ্বর রক্ষা কর" বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে। পাঠক! দেখ দেখি ক্রমে ক্রমে আমাদের কি দুর্দ্দশা হইতেছে।

তোমরা বিএ, এমএ দিয়া ছাই মাথা মুণ্ডু কি করিলে? পাশ্চাত্য বিদ্যাবলে বিজ্ঞানের খুব চর্চ্চা হয়েছে ও পরকীয় ভাষা ঠিক্ যেন মাতৃভাষার ন্যায় আয়ত্ত হইয়াছে, কিন্তু তাতে কি হইয়াছে? কৈ? কেহই ত কোনরূপ শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা করিয়া আজি পর্য্যন্ত দেশের কোন উন্নতিই করিতে পারিলে না? তোমরা এত ইংরাজী শিক্ষা করিলে, কৈ এক খান লোকোমটিব প্রস্তুত কি এক খানা পান্-দেওয়া ইস্পাতের রেল ঢালাই কর দেখি! এক খানা ইষ্টিমার, কি একটী রাইফাল রিভলবার প্রস্তুত করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া তোল দেখি! কলের সূতা কি কলের কাপড় প্রস্তুত করিয়া সাধারণের অন্নকষ্ট দূর কর দেখি! চীনেরা পর্সি-লেনের বাসন প্রস্তুত করে; তাই দেখে সাহেবেরা অমনি তার নকল করিয়া প্রচুর টাকা উপার্জ্জন করিতেছে; কৈ তোমরা ত তাহা এপর্য্যন্ত করিতে পারিলে না? যদি এ সকল করিতে পার, তা হলে বলি যে তোমরা পুরুষ বাচ্চা বট ও তোমাদের অন্তঃকরণে যথার্থ তেজেরও আবির্ভাব হইয়াছে; কিছুই করিতে পারিবে না, অথচ আমরা বিজ্ঞান জানি আমরা ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে পারি বলিয়া, তেড়ি কেটে সর্ব্বদা লোকের কাছে ড্যাব্ ড্যাবানি দেখাইবে,

ইহা কে সহ্য করিবে? তোমাদের মুখখানা ছিল বলিয়া কোন রূপে বাঁচিয়া বেড়াও, তা না হলে, এতদিন বিলাতের জুঅলজিকেল্ বাগানে নিয়ে গিয়ে তোমাদিগকে গরিলার উপর ক্লাসে রাখিয়া দিত; কেবল মুখের জোরে বাঁচিয়া বেড়াইতেছ। যাহারা কেবল দাসত্ব করিবে বলিয়া বিদ্যাভ্যাস করে তাহাদের উন্নতি আবার কবে হইবে?

বিলাত গমন করিয়া সিবিল হয়ে এলে, তোমারই মাসে ১০০০ টাকা বেতন হইল, সাধারণের তাহাতে কি হইল? বিলাতে যে রং দিয়া সূতা রক্তবর্ণ করে, একবার তাহা শিক্ষা করিতে যাও দেখি, ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে এখনি। চাষবাস, বাণিজ্য ব্যবসায়, শিল্পশিক্ষা ইত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কি করিলে? দেখ দেখি কি ছিল কি হইল।

বিদেশীয় লোকে দেশলাই, নকল পর্সিলেনের বাসন, ছুরি, কাঁচি, বাণ্ডিলের সূতা, ছুঁচ, কাচের গ্লাস, ও ঝাড় লণ্ঠন এবং কতকগুলা বোতল ও শিশি দিয়া, চাল, ডাল, গম, মসিনা ও চিনি প্রভৃতি উপাদেয় দ্রব্য সকল জাহাজ বোঝাই করিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে সেদিকে ত কেহই দৃষ্টি করিতেছে না; একবার আলোচনা করিয়া দেখ দেখি আমাদের কি অবস্থা হইয়াছে। এখান থেকে লবণের পোক্তান উঠিয়ে দিয়ে লিবারপুল হইতে লবণের আমদানি করার মধ্যে কত কৌশল রহিয়াছে; তোমাদের এম-এ রূপ দর্পণ দিয়া একবার দেখ দেখি কি দেখিতে পাইবে। একযুগের মধ্যে দেশে চারিবার দুর্ভিক্ষ হইতেছে কেন চিন্তা করিয়া দেখ কি?

কপিল পতঞ্জলি প্রভৃতি মহর্ষিগণ পূর্ব্বে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আগে ভ্রম প্রমাদ বলিয়া গণনা করিয়াছ, আর যে কর্ণেল অল্‌কট্ বাহির হইয়া বলিলেন যে, "হিন্দুদিগের যোগশাস্ত্রের তুল্য শাস্ত্র আর নাই, হিন্দুরা এক কালে ইহার বলে এই পাঞ্চভৌতিক শরীরেই মুক্ত হইয়া, চন্দ্রলোক প্রভৃতি নানালোকে পরিভ্রমণ করিতে পারিত," আর অমনি যোগশাস্ত্রে বিশ্বাস করিলে, অমনি সবচুলো হইয়া ১০ টাকা দিয়ে অল্‌কট্ খাতায় নাম লেখাইলে, অমনি হিমালয়ের গুহাশায়ী কুথুমীলালের জ্ঞানগোচর হইলে—দেখ দেখি তোমরা কিরূপ পাগল ও তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তিই বা কতদূর লঘু—পাশ্চাত্য সভ্যতা তোমাদিগকে যে একেবারে চোঙ্গার বানর করিয়া তুলিয়াছে তোমাদিগের অন্তঃকরণে এ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তিই নাই। হায়! এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে? কি ছিল কি হইল ইহা কি কেহই দেখিতেছ না?

দেশীয় চিকিৎসা-প্রণালী অন্তর্ধান করাতে তোমাদের একেবারে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সে দিকে কাহার দৃষ্টি আছে? কোটি কোটি টাকার বিলাতি ঔষধ বিক্রয় করিয়া, ভারতবর্ষকে ক্রমে ফকির করিয়া তুলিতেছে, এ সকল ভাবিয়া থাক কি?

ভীল, কোল, গারো, চীন, তাতার, হুন, খশ, ও সাঁওতাল প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যেই রোগ আছে এবং সকল জাতীয় লোকই রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়া থাকে, সেই নিমিত্ত সর্ব্বদেশীয় লোকের মধ্যেই প্রায় চিকিৎসক

আছে এবং তত্তদ্দেশোপযোগিনী চিকিৎসা প্রণালীও প্রচলিত আছে; তবে এর মধ্যে যে দেশ যত সভ্য, সেই দেশে চিকিৎসকেরা পয়সা উপার্জ্জনের জন্য তত চালাকি ও ভাণ করিয়া থাকেন।

দেশ যত সভ্যতার সোপানে অধিরোহণ করিতে থাকে, চিকিৎসা সম্বন্ধেও তত বড় বড় পুস্তক বাহির হইতে স্থরু হয়। ইংলণ্ডীয় লোক যখন গায় উলকি পরিয়া আপনাদিগকে শোভিত করিত এবং বনের পশু ধরিয়া খাইত ও পশু-চর্ম্ম পরিধান করিত, তখন ঐ দেশে মেটিরিয়া মেডিকা কি প্রাক্‌টিস্ অব মেডিসিন্ কিছুই ছিল না; তার পর সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে পেটের মধ্যে ছেলে কেমন করিয়া থাকে, তাহার পর্য্যন্ত প্রতিকৃতি হইল ও মানুষের শরীরের কোন্ স্থানে কোন্ শিরা আছে তাহারও নকল বাহির হইল।

আমাদিগের ভারতবর্ষীয় চিকিৎসকগণ কোন সময়ে এ বিষয়ের উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন দেশীয় চিকিৎসা-প্রণালীর আর তত তেজ নাই; ইংরাজী চিকিৎসাই এখন প্রায় ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু হিম-প্রধান দেশীয় ঔষধ এদেশের অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্য-রক্ষার উপযোগী কি না তাহা বিচার করিয়া কেহই দেখে না।

পূর্ব্বে কাহারও কোনরূপ পীড়া হইলে, দেশীয় বৈদ্যরাজেরা আসিয়া চিকিৎসা করিতেন, তাহাতেই সর্ব্বাঙ্গস্থন্দররূপে শরীর স্বচ্ছন্দ হইত এবং কবিরাজ মহাশয় চিকিৎসার দরুণ রোগীকে বা রোগীর পিতা মাতাকে সর্ব্বস্বান্ত

করিতেন না। তিনি বাড়ী যাইবার সময়ে গৃহস্থের নিকটে দুটী টাকা কি পারিতোষিকস্বরূপ একখানি নব বস্ত্র পাইলেই যথেষ্ট মনে করিতেন।

আজি কালি দেশের মধ্যে ডাক্তারি চিকিৎসা প্রচলিত হইয়া কি সর্ব্বনাশের গোড়াই হইয়াছে; এখনকার ডাক্তারদিগের মধ্যে অধিকাংশ ডাক্তারই গৃহস্থের বাড়ীতে প্রথমতঃ শনিরূপে গিয়া প্রবেশ করেন, তার পর নানাপ্রকার ভাণ করিয়া, পয়সা উপার্জ্জনের ফন্দি বাহির করিতে থাকেন। কিসে পয়সা বাড়িবে তাহার চেষ্টা তাঁহার বলবতী হইয়া উঠে; ছিছি এম্ ডির নাম করিতেও যে মনে আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

কলিকাতায় সেদিন একটা ছেলে খেলা করিতেছিল, বিলাতের ফের্‌তা একজন বড় ডাক্তার তাহার গুহ্যদেশে কার্‌বলিক এসিডের পিচ্‌কিরি দিয়া, তাহার প্রাণদণ্ড করিলেন, ইহাতে এম্ ডিকে কি বলিতে ইচ্ছা করে? এই ঘটনায় ছেলের বাপ অত্যন্ত কাতর হইয়া, কোর্টে নালিশ করিয়াছিলেন, তাহাতে ডাক্তার বাবুকে ৫০০ টাকা দণ্ড দিতে হইয়াছিল। ডাক্তারি চিকিৎসার কোন পরীক্ষক নাই এবং ভ্রমক্রমে মানুষ মারিয়া ডাক্তারদিগকে কাহার নিকটে হিসাব দিতে হয় না, তাই তাঁহারা অনায়াসে বাঁচিয়া বেড়ান, তা না হইলে, এতদিন কত বড় বড় ডাক্তারকে যে ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে হইত তাহা আর বলা যায় না। হাতুড়েদের ত আর কথায় নাই; তাহাদের জন্য একটা চিরস্থায়ী ফাঁসিকাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইত।

সামান্য সামান্য গৃহস্থদিগের মধ্যে যদি কেহ চোকে মুখে

পথ দেখিতে না পেয়ে একজন পয়সাখোর ডাক্তারকে ডাকিল তবে আর রক্ষা নাই। ডাক্তার বাবু পাল্‌কি করে এসে একটা সানাই হাতে করে নামেন এবং রোগীকে দেখিয়াই বলেন, "এ রোগটা বড়ই শক্ত রকম হইয়াছে, এতদিন কি করিয়াছিলে? ইহার নাম ডিস্‌কোপ্‌নিয়া, তবে বড় ভয় নাই আমাকে দুবেলা দেখিতে হইবে এবং একটু দীর্ঘকাল ঔষধ খাইলেই সব সারিয়া যাইবে।" পাঠক! এই পয়সা ধরিবার জাল পড়িল, এর পর যখন ডাক্তারবাবু খেপলা তুলিবেন তখন দেখিতে পাইবে।

রোগীর পিতা মাতা এই কথা শুনেই প্রথমতঃ চমকিয়া উঠেন ডাক্তারবাবুর হাতে পায় ধরিয়া বলেন "বাবু আমরা বড় গরিব, কোনরূপে দিনপাত করিয়া থাকি, অতএব যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র ছেলেটী ভাল হয়, সে বিষয়ে একটু মনোযোগ করিবেন, আজিকার ভিজিটের টাকা বাকি থাকিল, একেবারে দেওয়া যাইবে।

ডাক্তারবাবু এই কথা শুনে তখন চলিয়া গেলেন, আবার বৈকালে এলেন; রোগীর বুকে সানাই দিয়া বলিলেন ভয় নাই। তারপর গৃহস্থের নামে প্রত্যহ ছয়ডোস একোয়ার মূল্য ৵১২॥ হিসাবে ২।/১৭॥ পোনর দিনে মোট ৩৫॥২॥ এবং ভিজিটের ৩০ টাকা ও পাল্কি ভাড়া ৫॥৵০ সমুদয়ে ৭১৶২॥র একখানি বিল আসিয়া উপস্থিত হইল।

গৃহস্থ রামকমল বিশ্বাস বিল দেখিয়া মনে মনে বলিলেন, "ওমা একি সর্ব্বনাশ? আমার ছেলে বাঁচা অপেক্ষা মরা যে ভাল ছিল. ওমা এ কি হইল?"

যাহা হউক এখন তার কান্না শোনে কে? ডাক্তারের চর মধু বাঁটুয্যে নাছোড় বান্দা, সে বিলখানি দিয়া দরজায় বসিয়া পড়িল; বলিল, "টাকা না নিয়ে কোন মতেই উঠিব না।" বাবা ছিনে জোঁক অপেক্ষাও ভয়ানক রক্তশোষক! তখন আর কি হবে, গায় গু মাখিলে যমের দূত কখনই ছাড়িয়া দেয় না; গৃহস্থ তখন স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া আপাতত ৩০ টাকা দিয়া ছিনে জোঁক ছাড়াইলেন, আবার কোন্ দিন আসিয়া লাগিবে সে ভয়ও রহিয়া গেল।

পাঠক! এই কি উন্নতির অবস্থা? ১০০৲ টাকার ঔষধ বেচিয়া ৫০০০ টাকা লাভ না করিতে পারিলে ডাক্তারেরা কি রাতারাতি বড়মানুষ হইতে পারিত? ভিজিট নেবেন আরো একটাকার ঔষধে ৫০ টাকা করিবেন, ইহা যে বলিবে সেই বেটা পাজি হইবে, আর যে না বলিবে সেই ভদ্রলোক থাকিবে। আজি কালি লোকের চোক কাণ ফুটিয়াছে, কাজেই একথা লইয়া আন্দোলন করিয়া থাকে। ডাক্তারি চিকিৎসা চলিতেছে, অথচ সর্ব্বত্র এপিডেমিক ও ভয়ানক মারিভয়ও তুল্য রূপে রাজত্ব করিতেছে। হায় হায় সোণার ভারতে কি ছিল কি হইল? সে পবিত্র আচার ব্যবহার কোথায় গেল? আর্য্যসন্তান বলিয়া গৌরব করিতে এখনো ছাড়ি না কিন্তু আর্য্যসন্তানের মত কোন লক্ষণইত আমাদের শরীরে পরিদৃষ্ট হয় না; এখন অর্থের জন্য, বিলাসের জন্য অতি কুৎসিত কার্য্য করিতেও পশ্চাদ্বর্ত্তী নহি।

একজন বড় ডাক্তারের বাপ মরিয়াছিল, তিনি দিন-

মানে যথাসময়ে আতপ তণ্ডুলের অন্ন খাইয়া, নিয়ম রক্ষা করিতেন, রজনীতে উইল্‌সেনের বাড়ী থেকে ষাঁড়ের ডালনা ও রুটি আসিত তাই খেয়ে হবিষ্যান্নের পরিণাম রক্ষা করিতেন। উঃ—এ কথা বলিতে হইলেই লোকে বিশ্ব-নিন্দুক বলিয়া ঘৃণা করিবে, কিন্তু না বলিয়া ত আর থাকা যায় না। ভারতে কি ছিল আর কি হইয়াছে তাহা কি কেহই দেখিবে না।

ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাবলী গিয়াছে, ভারতের স্বাধীনতা গিয়াছে, ভারতের সমস্ত ভাল ভাল বহুমূল্য প্রস্তর গিয়াছে এবং সমস্ত রত্নের শিখামণি সে কহিণুর গিয়াছে; সে পবিত্রতা নাই, সে আচার ব্যবহার নাই, সে কালিদাস ভবভূতির ন্যায় কবি আর জন্মাইল না, সে ভীষ্ম, ভীম ও অর্জ্জুনের ন্যায় বীর আর দেখা দিল না। হায় হায় কি ছিল আর কি হইয়াছে ইহা কি আমরা বলিতেও অধিকারী নহি ?

সমাপ্ত।